ইসলাম বিতর্ক

(অনুবাদ সংকলন)

নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

ইসলাম বিতর্ক

(অনুবাদ সংকলন)

সম্পাদনা

শামসুজ্জোহা মানিক

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

ইসলাম বিতর্ক

সম্পাদনা: শামসুজ্জোহা মানিক

© শামসুজ্জোহা মানিক

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

মুদ্রন প্রকাশক: ব-দ্বীপ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১০

দ্বিতীয় ইবুক প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক
ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: অরণ্য আনোয়ার

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

ISBN: 978-984-8289-21-1

Islam Bitarka- Edited by Shamsuzzoha Manik
Published by: Istishon eBook
First published in November 2010
Second eBook published in November 2016

সম্পাদকের ভূমিকা

ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের কল্যানে বর্তমান পৃথিবীর ভাবজগতে যে বিপ্লব চলছে তার ঢেউ আছড়ে পরেছে ইসলাম ধর্মের উপরেও। যে ধর্ম এতকাল চরমতম অসহিষ্ণুতা ও হিংস্রতা দিয়ে তার বিরুদ্ধে সকল সমালোচনার মুখ বন্ধ রাখতে অভ্যস্ত ছিল তা এখন এই নূতন প্রযুক্তির প্রচার মাধ্যমের সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে। বোমাবাজি, হামলা, সন্ত্রাস, হত্যা কোনটা দিয়ে ইন্টারনেটকে ঠেকানো সম্ভব নয়। সুতরাং সারা পৃথিবীতে যারা এতকাল ইসলামের বিষয়ে বিচার ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তা করলেও প্রচারের সুযোগের অভাবে নিশ্চুপ থেকেছেন তারা এখন সবর হতে শুরু করেছেন। তাদের কলম বা কম্পিউটার থেকে এখন অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে ইসলামের উপর আলোচনা, সামালোচনা, পর্যালোচনা। বিদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এ ধরনের কয়েকটি ইংরেজি নিবন্ধের অনুবাদ নিয়ে প্রকাশ করা হল ইসলাম বিতর্ক নামক সংকলন গ্রন্থটি। উল্লেখ করা যায় যে, এখানে মুদ্রিত সবগুলি অণূদিত লেখাই আমার সম্পাদনায় পরিচালিত ওয়েবসাইট 'বঙ্গরাষ্টে' (www.bangarshtra.org) প্রকাশিত হয়েছে।

শামসুজ্জোহা মানিক

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর, ২০১০

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

কাশ্মীর: ইসলামের প্রসার এবং সূফীদের সন্ত্রাস

এম, এ, খান

কাশ্মীরে কীভাবে ইসলাম এসেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর আসে যে, সূফীদের শান্তিপূর্ণ মিশনারী প্রচারের মাধ্যমে কাশ্মীরে ইসলাম এসেছিল। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, সূফীদের কল্যাণে কাশ্মীরের হিন্দুদের জন্য বাস্তবতা ছিল ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক।

কাশ্মীরে কীভাবে ইসলাম এসেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর আসে যে, সূফীদের শান্তিপূর্ণ মিশনারী প্রচারের মাধ্যমে কাশ্মীরে ইসলাম এসেছিল।পৃথিবী ব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বজনীনভাবে সূফীদেরকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এক কিংবদন্তী অনুযায়ী কাশ্মীরে কোন এক সময় একজন রাজা ছিলেন যার কোন ধর্ম ছিল না। একদিন তিনি ঠিক করলেন যে তিনি কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করবেন। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় দলই রাজাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করতে এল। অতঃপর রাজা উভয় পক্ষের পরসপর বিরুদ্ধ বক্তব্য শুনে বিভ্রান্ত হলেন এবং ঠিক করলেন যে, “পরদিন সকাল বেলায় তিনি প্রাসাদ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যে ব্যক্তিকে প্রথম দেখবেন তিনি তার ধর্ম গ্রহণ করবেন।” (Chapter 2, Baharistan-i-Shahi, an anonymous 17th-century Persian book on the history of Kashmir, translated by Prof. K. N. Pundit)। এবং পরদিন রাজা একজন দরবেশের প্রথম দেখা পেলেন এবং এভাবে কাশ্মীর ইসলামে প্রবেশ করল।

অনেক জায়গাতে এই ধরনের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একজন সূফী তার

অলৌকিক ক্ষমতাবলে অথবা অন্য কোনভাবে সেখানকার রাজাকে দীক্ষিত করেছিলেন। এইভাবে ঐ স্থান শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে এবং ইসলামের এই শান্তিপূর্ণ প্রচারের জন্য সূফীদেরকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

আমার একজন কাশ্মীরী বন্ধু ইসলামের বর্বর শিক্ষার জন্য ইসলামের উচ্ছেদ চাইলেও আমাকে বলেছিলেন এই বর্বর চরিত্র সত্ত্বেও কীভাবে সূফীদের শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে কাশ্মীরে ইসলাম এসেছিল। বর্তমানে ইসলামের সেই শান্তিময় উপত্যকা কীভাবে বর্বরতার ভূমিতে পরিণত হয়েছে? এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন ওয়াহাবী মতবাদকে, যেটা তার মতে কুরআন ও নবীর প্রকৃত ইসলাম।

কাশ্মীর এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী সূফীদের শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে - এই ধারণা মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। ইসলামের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক এবং সূফীদের উপরে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিজ্ঞাত ডঃ য়োগিন্দর সিকান্তকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি এই কথাই বলবেন।

সহজে পাওয়া যায় এমন সব ঐতিহাসিক দলিল থেকে ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেলেও এই ধারণাই সফলভাবে এবং একচেটিয়াভাবে প্রচারিত হয়ে চলেছে।

কাশ্মীরে ইসলামী শাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জানা কঠিন। ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহামমদ বিন কাসিম কাশ্মীর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তারপর থেকে কাশ্মীর অনেকগুলি ইসলামী আক্রমণের শিকার হয়। মুসলমানরা যাকে নিয়ে গর্ব করে কিন্তু যিনি বর্বর-শ্রেষ্ঠ ছাড়া আর কিছু নন সেই সুলতান মাহমুদও সেখানে একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। হিন্দু অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার জন্য খলীফা আল মনসুর (৭৫৫-৭৪) হাশাম বিন আমরুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কান্দাহার এবং কাশ্মীরের মধ্যে বহু স্থান তিনি দখল করেন, তিনি "কাশ্মীরকে পদানত করে বহু সংখ্যক বন্দী ও দাসকে নিয়ে যান"

[Elliot & Dawson, History of India as Told by Its Historians (এতে মুসলমানদের দ্বারা লিপিবদ্ধ ঘটনাপঞ্জি থেকে বিভিন্ন অংশ নেওয়া হয়েছে) Vol 203Vol. 1. p. 122-23, 203]। সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদ তার পিতার মত কীর্তিমান ছিলেন না। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তার পিতার ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে "কাশ্মীরের সুরসুতি দুর্গ আক্রমণ করেন। নারী ও শিশু বাদে দুর্গের সকল সৈন্যকে হত্যা করা হয় এবং জীবিত নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়।"

এটা বলা কঠিন যে এ সকল অভিযানের মধ্যে কোনটি দ্বারা কাশ্মীরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে ইসলামীকরণে ইসলামের কথিত শান্তির প্রবক্তা সূফীদের যে একটা প্রধান ভূমিকা ছিল সে কথা বলা যায়। কিন্তু সেটা ছিল বর্বরোচিত।

কাশ্মীরে জনগণের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই সেটা হচ্ছে এ রকম যে, ১৩৭১ অথবা ১৩৮১ সালের দিকে একজন বিখ্যাত সূফী দরবেশ বা সাধু সাঈদ আলী হামদানী কাশ্মীরে প্রবেশ করেন, এবং তার সঙ্গে ইসলামও কাশ্মীরে প্রবেশ করে। তিনি প্রথম যে কাজ করেছিলেন সেটা হচ্ছে "একটি ছোট মন্দির যেটাকে ধ্বংস করা হয়েছিল" সেই জায়গার উপর তার খানকা (আস্তানা বা আশ্রম) স্থাপন করা (Baharistan, p. 36)। তার আগমনের পূর্বে শাসনকারী সুলতান কুৎবুদ্-দীন ইসলামী আইন বলবৎ করার ব্যাপারে খুব সামান্যই মনোযোগ দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের সহনশীল হিন্দু সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের ভিতরে সুলতান থেকে কাজী পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মুসলমানরা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল (Baharistan, p. 37) 37।

কিন্তু সূফী দরবেশ সাঈদ হামদানী কাশ্মীরী মুসলমানদের এই সকল কার্যকলাপ দেখে আতঙ্কিত হন, এবং তিনি ইসলামী নিয়ম পালনে শৈথিল্য দূর করে গোঁড়া ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। শাসক কুৎবুদ্-দীন তার ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী গোঁড়ামি অনুশীলন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু "আমীর সাঈদ আলী হামদানীর ইচ্ছা

এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইসলাম প্রচারে ব্যর্থ হন” (ঐ)। এর ফলে সূফী দরবেশ পৌত্তলিক সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্ম শাসিত দেশে বাস করতে না চেয়ে কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান।পরবর্তী কালে তার পুত্র আরেক বিখ্যাত সূফী দরবেশ আমীর সাঈদ মুহাম্মদ বিখ্যাত প্রতিমা ধ্বংসকারী সুলতান সিকান্দারের শাসনকালে কাশ্মীরে আগমন করেন। সুলতান সিকান্দার পবিত্র সূফী দরবেশ সাঈদ মুহামমদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এতটা বর্বর ছিলেন না। সূফী দরবেশ কাশ্মীরে ইসলামী আইন কার্যকর করার জন্য সিকান্দারকে প্রণোদিত করেন। সুলতান কুৎবুদ্-দীন সূফী দরবেশের নির্দেশনা না মানলেও সিকান্দার তা মেনে নিতে রাজী হন। এইভাবে কাশ্মীর থেকে মূর্তিপূজা এবং তার প্রবক্তাদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সিকান্দার এবং সূফী সাধক সাঈদ মুহামমদ ঐক্যবদ্ধ হন।

দিল্লীর সুলতানের একজন ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ফারিশতার (মৃত্যু- ১৬১৪) মত অনুযায়ী (History of the Rise of the Mahomedan Power in India, Vol. 1V. 1997, imprint, p. 268) সিকান্দার আদেশ জারী করেন: “.... কাশ্মীরে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর বসবাস বেআইনী ঘোষণা ক’রে; এবং তিনি চান যাতে কেউ কপালে কোন চিহ্ন না দেয়। .... সবশেষে তিনি সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত প্রতিমা ভাঙ্গার এবং সেগুলি গলিয়ে ধাতব মুদ্রায় পরিণত করার উপর জোর দেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাদের ধর্ম অথবা দেশ ত্যাগের পরিবর্তে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কেউ কেউ বাসভূমি ত্যাগ করে দেশান্তরী হন, কেউ কেউ বিতাড়নের শাস্তি এড়ানোর জন্য মুসলমান হন। ব্রাহ্মণরা দেশান্তরী হলে সিকুন্দুর (সিকান্দার) কাশ্মীরের সকল মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দেন।.... কাশ্মীরের সকল প্রতিমা ধ্বংস করে তিনি ‘প্রতিমা ধ্বংসকারী’ এই উপাধি অর্জন করেন।”

আরেকটি সপ্তদশ শতাব্দীর পারসীয় বিবরণ HM Chaudurah-এরTarikh-i-Kashmir-এ বলা হচ্ছে, সিকান্দার “অবিশ্বাসীদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনের কাজে অবিরামভাবে ব্যস্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন” (Trans. Razia Bano, Delhi, 1991, p. 55)।

এটাই হচ্ছে বিদ্বান ফারিশতার নিকট সুলতান সিকান্দারের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর জন্য আসল কৃতিত্ব কার? এই প্রশ্নের উত্তর BaharistanBaharistanBaharistan Baharistan-i-Shahii-এর গর্বিত লেখকের কথা থেকেই বের করে নিন যিনি লিখছেন, "... এই ভূমির বাসিন্দাদের বিবেকের আয়না থেকে নাস্তিকতা এবং সত্য ধর্মে অবিশ্বাসের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলার কৃতিত্ব" সূফী দরবেশ সাঈদ মুহাম্মদের (ঐ, পৃঃ ৩৭)।

প্রতিমা ধ্বংসকারীর পুত্র আমীর খান (আকা আল্লী শাহ্) কাশ্মীরে হিন্দু নিধন অব্যাহত রাখেন। ফারিশতা বলেন, "এরপরেও যে সামান্য কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ তাদের স্ব-ধর্মে অটল ছিলেন তাদেরকে নির্যাতন করেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাদের সকলকে হত্যা করেন। এরপরেও যারা কাশ্মীরে ছিলেন তাদের সকলকেই সেই রাজ্য থেকে বিতাড়ন করেন" (ঐ, পৃঃ ২৬৯)।

এরপর উদার এবং সহিষ্ণু সুলতান জয়নুল আবেদীন (১৪২৩-১৪৭৪) নিগৃহীত অমুসলমানদের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনেন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অনুমোদন দেন, এমনকি জবরদস্তিমূলকভাবে ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরকেও তাদের নিজ ধর্মে ফিরে যেতে দেন। এটা হিন্দু ধর্মের সমৃদ্ধি ঘটতে সাহায্য করে, "যা কিনা প্রতিমা ভগ্নকারী সুলতান সিকান্দারের ইতিপূর্বেকার শাসনকালে উচ্ছেদ হয়েছিল" (ঐ, পৃঃ ৭৪)। সিডনি ওয়েন বলছেন ভিন্ন ধরনের মানুষ জয়নুল আবেদীনের শাসনাধীনে, "অনেক হিন্দু (অর্থাৎ জবরদস্তির মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হিন্দুগণ) হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তিত হয়" (From Mahmud Ghazni to the Disintegration of Mughal Empire, Delhi, p. 127)| Baharistan-i-Shahi-এর আতঙ্কিত লেখক সুলতান জয়নুল আবেদীনের অধীনে হিন্দুধর্মের উত্থান এবং ইসলাম ধর্মের পতনের কথা উল্লেখ করেন (পৃঃ ৭৪):

"... অবিশ্বাসীরা এবং তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনৈতিক আচার-আচরণ এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, এমনকি এ দেশের উলেমা (জ্ঞানী সম্প্রদায়), সাইয়ীদ

(সমভ্রান্ত) এবং কাজীগণও (ইসলামী বিচারক) এগুলির কোন রকম বিরোধিতা করার পরিবর্তে বরং এগুলি পালন করতে শুরু করেন। তাদেরকে নিষেধ করার মত কেউ ছিল না। এর ফলে ইসলাম ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর অনুশাসন ও নীতিমালা পালনে শিথিলতা দেখা দেয়; প্রতিমা পূজা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনৈতিক আচার-অনুষ্ঠান বিস্তার লাভ করে।"

আকবরের মত সুলতান জয়নুল আবেদীন ধার্মিকদেরকে অগ্রাহ্য ও ক্রুদ্ধ করে সকল ধর্মের প্রতি তার উদার কর্মনীতি অনুসরণ করেন। উদাহরণ হিসাবে পারস্য দেশীয় পণ্ডিত মুল্লা আহমদের চিঠির কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন,

"... তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদেরকে অপমান করা।... তাদেরকে অপমানিত করার জন্যই ঈশ্বর জিযিয়া কায়েম করেছিলেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অবমাননা এবং মুসলমানদের মর্যাদা ও সমমান (প্রতিষ্ঠা)" (Quted by KS Lal, Theory and Practice of Muslim State in India, p.113))।

কিন্তু মালিক রাইনা এবং কাজী চাকের রাজত্বকালে কাশ্মীরের অমুসলিমদের উপর পুনরায় সন্ত্রাস নেমে এল। তারা হিন্দুদেরকে তলোয়ার দ্বারা ইসলামে ধর্মান্তরিত করলেন। এবার উস্কানীদাতা ছিলেন আরেক সূফী দরবেশ আমীর শামসুদ্-দীন মুহামমদ ইরাকী, যিনি কিনা কাশ্মীরে আগত সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী সাধক হিসাবে পরিচিত।

মালিক মুসা রাইনা ১৫০১ সালে কাশ্মীরের প্রশাসক হবার পর মুহামমদ ইরাকী কাশ্মীরে আগমন করেন, এবং তার সঙ্গে জোট বেঁধে ও তার পৃষ্ঠপোষকতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে যা করেন সে সম্পর্কে Baharistan-i-Shahi (p. 93-94))-তে বলা হয়েছেঃ

"আমীর শামসুদ্-দীন মুহামমদ সকল মূর্তিপূজার গৃহ পাইকারীভাবে ধ্বংস করেন এবং সেই সঙ্গে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের ভিত্তিমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন।

মূর্তিপূজার প্রতিটি গৃহ ধ্বংস করার পর ইসলামী কায়দায় উপাসনা করার জন্য তার উপর মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দেন।”

এবং “শামসুদ্-দীন ইরাকীর অনুরোধে মুসা রাইনা আদেশ জারী করেন যে, প্রত্যেক দিন ১৫০০-২০০০ অবিশ্বাসীকে মীর শামসুদ্-দীনের অনুসারীরা তার বাড়ীর দরজার সামনে নিয়ে যাবে, তারা তাদের পবিত্র সূতা খুলে ফেলবে, তাদেরকে কলেমা (ইসলামের মূল মন্ত্র) পড়াবে, খৎনা করবে এবং গরুর মাংস খাওয়াবে”; এবং এইভাবে “বলপ্রয়োগ এবং বাধ্যতাপূর্বক ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) হিন্দু পরিবারকে ইরাকীর ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করানো হল (কাহ্‌রান ওয়া যাবরান)” (ঐ, পৃঃ ১০৫-১০৬)।

যখন সুলতান মুহাম্মদ শাহের অধীনে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাজী চাক সেনানায়ক হলেন তখন সাধু সুলভ ইরাকী তার ভয়াবহ কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন। Baharistan-i-Shahi (p. 116)-তে বলা হয়েছে: “তিনি (কাজী চাক) আমীর শামসুদ্-দীন মুহাম্মদ ইরাকীর যে একটা প্রধান নির্দেশ কার্যকর করেন সেটা হল এ দেশের অবিশ্বাসী ও বহুদেবতাবাদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা।”এই নিহতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যারা মালিক রাইনা কর্তৃক জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও পরবর্তী সময়ে বহুদেবতাবাদ (হিন্দুধর্ম)-এ ফিরে গিয়েছিল। মুসলমানরা এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, এই ধর্মত্যাগীরা “পাছার নীচে পবিত্র কুরআন রেখে তার উপর বসেছিল।” এটা শুনে সূফী দরবেশ ক্রুদ্ধ হয়ে কাজী চাকের নিকট এই বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন (ঐ, পৃঃ ১১৭):

“এই মূর্তি পূজারী সম্প্রদায় ইসলামী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ ও তাতে আত্মসমর্পণ করার পর এখন ধর্মভ্রষ্টতা ও ধর্মদ্রোহে ফিরে গেছে। এখন যদি আপনি নিজে শরীয়ার বিধান অনুযায়ী শাস্তি (ইসলামে ধর্মদ্রোহের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু) না দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত শাস্তি না দেন তাহলে আমার নিকট স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক হবে।”

লক্ষ্য করুন যে, কুরআন অবমাননার যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে ইরাকী তার উল্লেখ মাত্র করছেন না, বরং তিনি একবার ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দুদের দ্বারা তা পুনরায় পরিত্যাগ করার কথা বলছেন ইসলামে যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। বাহারিস্তান-ই-শাহী (Baharistan-i-Shahi)-তে বলা হচ্ছে, ক্রুদ্ধ সূফী দরবেশকে শান্ত করার জন্য মালিক কাজী চাক "অবিশ্বাসীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।" আশুরার পবিত্র পর্বের দিনকে এইভাবে হত্যার দিন হিসাবে ধার্য করা হয় (মুহররম, ১৫১৮ সাল; ইরাকী ছিলেন শিয়া)। বাহারিস্তান-ই-শাহীতে আরও বলা হচ্ছে:

"... প্রায় শাতশত থেকে আটশত অবিশ্বাসীকে হত্যা করা হয়। যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা ছিলেন সেই সময় অবিশ্বাসীদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব" (পৃঃ ১১৭)।

Baharistan-i-Shahi-এর গর্বিত লেখক আরও বলছেন, "তরবারির মুখে কাশ্মীরে অবিশ্বাসী ও বহুদেবতাবাদীদের সমগ্র সম্প্রদায়কে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হল। এটা মালিক কাজী চাকের একটা প্রধান কীর্তি" (পৃঃ ১১৭)।

এই ভয়ঙ্কর কাজের নির্দেশ যিনি দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু মহান সূফী দরবেশ ব্যতীত আর কেউ নন।

সূফীদের আসল চরিত্র তুলে ধরার জন্য আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই। ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রসারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসাবে মুসলমানরা যে কাশ্মীরকে ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করে সেই কাশ্মীরের অবস্থা হচ্ছে এই! চমৎকার শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি বটে! এবং এটাই হচ্ছে মুসলিম পৃথিবী থেকে ভারতে আগত সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ সূফীদের কীর্তি-কাহিনী।

ভারতের অন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সূফীদের কাহিনীও এর চেয়ে ভাল কিছু নয়। অবিশ্বাসীদের উপর নরমেধ যজ্ঞ চালাবার জন্য তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসত নিকৃষ্ট জিহাদী যোদ্ধাদেরকে। আজমীরে মঈনুদ্দীন চিশতি এসেছিলেন মুহাম্মদ ঘৌরীর সেনাবাহিনীর

সঙ্গে, যে ঘৌরী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণভাবে মানবিক ও মহানুভব রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেছিলেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়া মূলতানে এক জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন নাসিরুদ্দীন কিবচার সঙ্গে থেকে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সূফী দরবেশ শেখ জালাল সিলেটের হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে জিহাদী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

এবং এই সমস্ত সূফীই ঐসব রক্তাক্ত যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকাকে নির্ধারক হিসাবে দাবী করেছেন। এবং এইভাবে ভারত থেকে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা থেকে বলকান পর্যন্ত সর্বত্র শ্রেষ্ঠ সূফীদের অধিকাংশেরই কাহিনী হচ্ছে এই একই রকম যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ ও রক্তপাতময়।*

*সূফীদের লোকহর্ষক কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন আমার বই, Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery, p. 115-133.

(নিবন্ধটি M. A. Khan-এর Kashmir: Propagation of Islam and Terror of the Sufiss-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)-এ ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। এম, এ, খান ইসলাম ওয়াচের সম্পাদক এবং Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery- এর

পাকিস্তানের তালেবানীকরণ: আদিপিতাদের স্বপ্ন পূরণ

এম, এ খান

সমগ্র পাকিস্তানের তালেবানীকরণ যখন অব্যাহতভাবে চলছে তখন দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে বলে চলেছেন কীভাবে তালেবানরা আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মত পাকিস্তানের আদিপিতাদের সেক্যুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে চূরমার করছে। তাদের কথা শুনে মনে হয় যেন এই আদিপিতারা সত্যিই একটা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় নিজেদের সুবিধামত এখান সেখান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি দিতে পারদর্শী বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য জিন্নাহ্ স্বপ্ন কেমন ছিল সেটা দেখাবার জন্য জিন্নাহ্ এই কথাটা অবশ্যই উদ্ধৃত করবে, “সময়ের পরিক্রমায় আপনারা দেখতে পাবেন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থে নাগরিক হিসাবে হিন্দুরা হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমানরা মুসলমান থাকবে না; আমি কথাটা ধর্মীয় অর্থে বলছি না, কারণ সেটা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার।”

পাকিস্তান যে দ্রুত তালেবানীকরণের (বিশ্বজনীনভাবে ক্রমপ্রসারমান প্রবণতা) দিকে

ধাবিত হয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে প্রবেশ করছে, তাদের সেই আশঙ্কার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে, এই সব তথাকথিত প্রগতিশীল উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী আসলে হয় অর্ধশিক্ষিত, নয় ডাহা মিথ্যাবাদী। এবং এদের পক্ষে কোন ক্রমেই অজ্ঞতা পূজারী ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর লড়াই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই রকম লোকেরা যখন একটা জাতির প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তির কাণ্ডারী হয় তখন সেই জাতির পরিণতি কী হতে পারে পাকিস্তানের পিছন দিকে যাত্রা দেখেই সেটা চমৎকারভাবে বুঝা যায়।

বিশ্ব জুড়ে মুসলিম সমাজগুলি যখন সহিংস এবং অতীত বর্বরতায় প্রত্যাবর্তনকামী ইসলামপন্থীদের দিক থেকে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখন আমরা যদি এই ভয়ানক বিপদ থেকে আসলেই উদ্ধার পেতে চাই তবে আমাদের দরকার হচ্ছে এমন একদল বুদ্ধিজীবীর যারা হবেন ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল এবং নির্মম সত্য ভাষণে হবেন দ্বিধাহীন। অসততা এবং মিথ্যা দিয়ে যেমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না তেমন অজ্ঞতাও কোন কাজে লাগে না। আমরা হয়ত তালেবানদের আদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে পারি, যেই আদর্শ বা কর্মসূচী সম্পূর্ণরূপে কোরআন এবং সুন্নাহ (নবীর ঐতিহ্য)--এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তারা এই ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সৎ এবং দ্বিধাহীন। তালেবানরা যেই মানুষদেরকে তাদের আদর্শে দীক্ষিত করতে চাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে তালেবানদের সাফল্য নজর কাড়ার মত।

ইতিপূর্বে জিন্নাহর তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত উক্তি যেটা উদ্ধৃত করেছিলাম সেটা ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত হয় এবং জিন্নাহ স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তার তখনকার একটি বক্তৃতা থেকে নেওয়া। এটা স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোতুষ্টির জন্য প্রদান করা হয়েছিল। কারণ তখন তাদের স্বীকৃতি, সমর্থন এবং সাহায্য পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। উক্ত কথার পরিবর্তে বরং জিন্নাহর ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেখতে হবে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন পরিচালনা কালে তিনি যেসব বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং কর্মকাণ্ড করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কী চিন্তা ছিল সেটা বুঝার সুবিধার জন্য জিন্নাহর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা মুহাম্মদ ইকবালের একটা বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত বক্তৃতাটি ইকবাল ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভায় সভাপতির ভাষণে প্রদান করেছিলেন, যার ভিতর ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের সারবস্তু। ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী আদর্শের অসঙ্গতিকে এই বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়েছে। ইকবালের ভয় ছিল যে, অখণ্ড ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হবে - ধর্ম নিরপেক্ষ পাশ্চাত্যে যে জঘন্য ব্যাপারটা হয়েছে। তিনি বলেন,

"ধর্ম যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার এ কথাটা কেবল ইউরোপীয়দের মুখেই শোভা পায়।... কোরআনে ব্যক্ত নবীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এ থেকে সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন।"

সুতরাং তিনি ভারতে মুসলিম সমাজ যে সমস্যাকে মোকাবিলা করছিল সেই সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

"সুতরাং ইসলাম যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তার সঙ্গে তার ধর্মীয় আদর্শ জীবন্তভাবে সংযুক্ত। একটির অস্বীকৃতি পরিণামে আর একটির অস্বীকৃতিতে পরিণত হবে। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত ভিত্তিক জাতিগত ধারায় রাষ্ট্র গঠনের অর্থ যদি হয় ইসলামী সংহতি থেকে বিচ্যুতি তবে সেটা একজন মুসলমানের নিকট হবে সম্পূর্ণরূপে অচিন্তনীয়। এটা এমন একটি বিষয় যেটা বর্তমান ভারতের মুসলমানদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

এরপর ইকবাল তার বক্তব্যের জের টেনে "দ্বিজাতিতত্ত্ব" উপস্থাপন করেন।

"আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বালুচিস্তান সমন্বয়ে গঠিত একটি একক রাষ্ট্র দেখতে চাই।"

ইকবাল তার মৃত্যু (১৯৩৮) পর্যiত একটি পৃথক মুসলিম ভূমির জন্য এই প্রচারাভিযানকে জোরদার করেন। এবং এটাকে জিন্নাহর হাতে অর্পণ করেন। অগণিত মানুষের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাতের বিনিময়ে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লামা ইকবালের আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণতা দান করলেন জিন্নাহ।

অধিকন্তু "পাকিস্তান" শব্দের অর্থ হলো "পবিত্র ভূমি"। ইসলামে অমুসলমানরা হচ্ছে নোংরা, অপবিত্র (কোরআন ৯:২৮)। সুতরাং নোংরা, অপবিত্র অমুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নকৃত পবিত্র জনগোষ্ঠী হিসাবে কেবলমাত্র মুসলমানদের বাসভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সতর্কভাবে "পাকিস্তান" নামটি বেছে নেওয়া হল। আর এই বিশুদ্ধ ও জীবাiতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য "জিহাদ" অথবা "পবিত্র যুদ্ধ" হল জিন্নাহর হাতিয়ার। জিহাদের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা, বহিষ্কার, দাসত্বে নিক্ষেপ এবং জবরদস্তিমূলক ধর্মাiতরকরণ দ্বারা নবী মুহাম্মদ আরবে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সেই দৃষ্টান্তকেই জিন্নাহ অনুসরণ করার চেষ্টা করলেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ডাইরেক্ট এ্যাকশন র‌্যালীর মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য জিন্নাহর প্রচারাভিযানের যে সূত্রপাত হয় সেটি ছিল "জিহাদ"। যে দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেই দিনটি ছিল রমযানের ১৮ তারিখ; এই দিনটিতে যুগান্তকারী বদর যুদ্ধে নবীর বিস্ময়কর বিজয় অর্জিত হয়। জিন্নাহর মুসলিম লীগের যে গোপন প্রচারপত্র মুসলমানদের মধ্যে বিলি করা হয় (মসজিদে ধর্মোপদেশের সময়েও পাঠ করা হয়) সেই প্রচারপত্রে বলা হয়,

"মুসলমানদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, রমযান হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়। রমযান হচ্ছে সেই মাস, যে মাসে জিহাদের অনুমোদন দেওয়া হয়। রমযান হচ্ছে সেই মাস, যে মাসে বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যেটা ছিল ইসলাম এবং ধর্মহীনতা (অর্থাৎ পৌত্তলিকতা, যা দিয়ে এখানে হিন্দু ধর্মকে বুঝানো হচ্ছে)-এর মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ৩১৩ জনের মুসলিম বাহিনী জয় লাভ

করে; আবার এই রমযান মাসেই পবিত্র নবী ১০,০০০ লোকের বাহিনী নিয়ে মক্কা জয় করেন এবং আরবে পরম সুখের রাজ্য এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম লীগ ভাগ্যবান যে, এই পবিত্র মাসে তারা তাদের সংগ্রাম শুরু করছে।

"আল্লাহর কৃপায় ভারতে আমরা দশ কোটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা হিন্দু এবং বৃটিশদের গোলামে পরিণত হয়েছি। আমরা এই পবিত্র মাসে আল্লাহর নামে জিহাদ শুরু করছি। প্রার্থনা করুন, আল্লাহ তুমি আমাদের শরীর ও মনে বলবান করো, আমাদের সকল প্রচেষ্টায় তুমি সাহায্য করো, কাফিরদের (কাফির অর্থাৎ আল্লাহর শত্রু যেমন, হিন্দুরা) উপর আমাদের জয়যুক্ত করো। আল্লাহর কৃপায় আমরা যেন ভারতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী রাজ্য গড়ে তুলতে পারি।"

তখন মুসলিম লীগ সরকার ছিল বাংলার ক্ষমতায়। তার নির্দেশে পুলিশের প্রশ্রয়ে কলকাতায় ডাইরেক্ট এ্যাকশনের মাধ্যমে সূচিত জিহাদ দ্বারা মুসলমানরা হিন্দু এবং শিখদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ চালায়। দেড় দিনের ভয়ঙ্কর বর্বরতার শিকার হবার পর হিন্দু এবং শিখরা পাল্টা আঘাত হানে এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীদেরকে সংখ্যা শক্তি দ্বারা পরাভূত ক'রে একইভাবে প্রতিশোধ নেয়। পাঁচ দিনের অব্যাহত সহিংসতা পাঁচ হাজার জীবনকে কেড়ে নেয় এবং যে কলকাতায় মুসলমানরা ছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সেখানে মুসলিম হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩%।

যে অঞ্চলগুলি পরে পাকিস্তানে পরিণত হয় ভারতের মুসলিম প্রধান সেই সব অঞ্চলে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের পরবর্তী মাসগুলিতে প্রায়শ অনেক বেশী ভয়াবহতা এবং হিংস্রতা নিয়ে দাঙ্গা (ব্যতিক্রম হচ্ছে হিন্দু প্রধান বিহারের দাঙ্গা যা কলকাতা এবং নোয়াখালীর দাঙ্গার পর ঘটে) ছড়িয়ে পড়ে। এইসব দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকাগুলি থেকে হিন্দু, শিখ এবং অন্য অমুসলিমদেরকে উচ্ছেদ করা। সেটা গণহত্যা দিয়ে হোক, বহিষ্কারকরণ দিয়ে হোক, জবরদস্তিভাবে ধর্মান্তরকরণ দিয়ে হোক এবং এমন কি অপহরণের মাধ্যমে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেই হোক।

নোয়াখালী দাঙ্গায় (অক্টোবর, ১৯৪৬) হিসাবকৃত চার লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৯৫ শতাংশকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

যখন মুসলমানরা এক অঞ্চলে অথবা অন্যত্র বিধর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে চলেছিল এবং যখন হিন্দু এবং শিখরা দেখলো যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়েছে তখন তারা ১৯৪৭ সালের আগস্টের প্রথম দিকে পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে, যেটা ছিল বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলে তাদের সমধর্মাবলম্বীদের উপর অব্যাহত এবং সাম্প্রতিক সময়ে বর্ধিত সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

জিন্নাহ যে জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত করলেন তা তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হল। সেটা হল পাকিস্তান সৃষ্টি। যার জন্য মূল্য দিতে হল উভয় পক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ পর্যাৗত জীবনকে। উভয় পক্ষের প্রাণহানির পরিমাণ প্রায় সমান। কয়েক মিলিয়ন হিন্দু এবং শিখকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হল, কয়েক লক্ষ হিন্দু এবং শিখ নারীকে ধর্ষণ করা হল এবং সমসংখ্যক নারীদেরকে মুসলিম গুণ্ডারা অপহরণ এবং বলপূর্বক বিবাহ করল।

প্রায় দুই কোটি মানুষ বাড়ীঘর এবং সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হল। কিন্তু নোংরা ও অপবিত্র বিশ্বাসহীনদের থেকে মুক্ত এবং মুসলমানদের জন্য একটি পবিত্র ভূমি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত জিন্নাহর অভিযান বিরাটভাবে সফল হলেও অমুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজটা তখনও কিছু সংখ্যক নাছোড়বান্দা হিন্দু এবং শিখের জন্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল। এই নাছোড়বান্দারা না ছাড়তে চায় তাদের বাপ-দাদার ভিটা, না ছাড়তে চায় তাদের ধর্ম। তবে আগে হোক পরে হোক পাকিস্তানকে বিশুদ্ধ করার কাজটা চলতে থাকল এবং প্রায় সম্পূর্ণ হল। বর্তমান পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে হিন্দু জনসংখ্যা যেখানে ছিল ১০ শতাংশ সেটা এখন সেখানে এক শতাংশেরও নীচে নেমে গেছে। ১৯৪৭ সালের পর প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ হিন্দু শুধু বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হল। এখানে হিন্দু জনসংখ্যা ২৫-৩০ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ১০ শতাংশে নেমে এসেছে।

যে তালেবানরা গোটা পাকিস্তানকে দ্রুত গতিতে গ্রাস করছে স্পষ্টতই তারা ইকবাল এবং জিন্নাহর স্বপ্ন পূরণে অগ্রসর হচ্ছে, যে স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানকে মুসলমানদের জন্য পবিত্র ভূমিতে পরিণত করা, যেখানে ইসলামী আইন হবে রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি।

ইসলামের প্রতি জিন্নাহর আনুগত্যের অভাব সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়: যেমন, তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন, তিনি সামান্যই মুসলমান ছিলেন, যিনি শুকরের মাংস এবং মদ্য পান পছন্দ করতেন, ইত্যাদি। এটা সত্য হতে পারে। তিনি এমনকি সত্যিকার অর্থেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সেটা কেবলমাত্র তার মনের ভিতরেই ছিল। তার মুসলিম লীগ পার্টি দ্বারা পরিচালিত সাধারণ মুসলমানরা, যারা তার আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য চরম বর্বরতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা অতশত বুঝত না। তারা সেটুকুই শুধু বুঝত যেটুকু ইকবাল এবং জিন্নাহ স্পষ্টভাবে এবং জোরালোভাবে তাদেরকে বুঝাতেন। কোন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য "জিহাদ" পরিচালিত হয় না। দুইজন ভণ্ড মুসলমানের মনের ভিতরে কী ছিল না ছিল তা গুরুত্বহীন। যেই সাধারণ মুসলমানরা এই আদর্শকে এগিয়ে নিয়েছিল তাদেরকে কী বলা হয়েছিল এবং তাদের সামনে কোন আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়েছিল কেবলমাত্র সেটাকেই হিসাবে নিতে হবে।জিন্নাহ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সকল শাসক একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র লাভের পাওনা থেকে পাকিস্তানীদেরকে বঞ্চিত রেখে তাদেরকে দীর্ঘকাল বোকা বানিয়েছিলেন। তালেবানদেরকে ধন্যবাদ যে তারা পাকিস্তানীদের "স্বপ্ন রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে, যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কঠোর সংগ্রাম এবং বিপুলভাবে আত্মদান করেছিল। এই প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলাম পাকিস্তান-এর চির-অকপট নেতা কাজী হোসেইন আহমদ-এর কথা সবচেয়ে শিক্ষণীয়,

"বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানীদের দীর্ঘকালের প্রাণের দাবী হচ্ছে পাকিস্তানের সম্পূর্ণরূপে ইসলামীকরণ। শুধু তাই নয়, তালেবানীকরণের ঘনায়মান বিপদকে মোকাবিলা করারও এটাই যথাযথ উপায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনগণের প্রাণের এই দাবীকে অবদমিত করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই বিপদের আশঙ্কা দিন দিন বেড়েই

চলেছে।”

বব মার্লের গানের কলির মতো করে বললে, “. . .তুমি সব সময় সব মানুষকে বোকা বানাতে পারবে না”।

(নিবন্ধটি M. A. Khan-Gk Talibanization of Pakistan: Realizing the Dreams of Founding Fathers-এর বাংলায় ভাষান্তর। লেখক এমএ খান Islam Watch (www.islam-watch.org)-এর সম্পাদক এবং Islamic Jihad: A Ligacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery-এর লেখক। নিবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে ভাষান্তরিত এবং বঙ্গরাষ্ট্রে প্রকাশিত। ইতিপূর্বে এটির মূল ইংরাজী লেখা Islam Watch-এ প্রকাশিত হয়।)

মুসলমানদেরকে আক্রমণ ও হত্যার দরুণ কি মুহাম্মদ মদীনার ইহুদীদেরকে উচ্ছেদ করেন?

এম, এ, খান

ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় নবী মুহাম্মদ (৬১০-৬৩২) মদীনাকে বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ ক'রে সেখানে শত শত বৎসর যাবৎ বসবাসকারী ইহুদীদের উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন ও হত্যা চালান, যা ছিল ইহুদীদের উপর পরিচালিত প্রথম গণহত্যা। মুহাম্মদ দুইটি ইহুদী উপজাতিকে আক্রমণ ও তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়ন করেন; এছাড়া তৃতীয় উপজাতি বানু কুরাইযার পুরুষদের সকলকেই পাইকারীভাবে হত্যা করেন এং তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাসে পরিণত করেন। মুহাম্মদ বহুদেবতার পূজারীদের সামনে ধর্মান্তরণ অথবা মৃত্যু এই দুইটির যে কোন একটি বেছে নিবার বাধ্যবাধকতা উপস্থিত করে আরব থেকে মূর্তি পূজা নিশ্চিহ্ন করেন। এই ধরনের বিধানের সমর্থনে তিনি উপস্থিত করেন আল্লাহর ওহী, যেমন:

কুরআন- ৯:৫: "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এবং কুরআন- ৮:৩৯: "এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিৎনা (ফিৎনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শির্ক,

কুফ্র, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্ দীন (দীন অর্থ ধর্ম) সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক দ্রষ্টা।” ইত্যাদি।

মুহাম্মদের এই ধরনের নৃশংসতার সপক্ষে মুসলমানরা সর্বদা যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। যেমন আবু শুজা নামে একজন বিশিষ্ট ইসলামী প্রচারণাকারী দাবী করেন, “মুসলমানদেরকে আক্রমণ ও হত্যা করার দরুন ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল। এটাকে আজকের গাজার আয়না বিবেচনা করুন।”

ইসলামী শাস্ত্র যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে আমি এই ধরনের দাবী ভিত্তিহীন দেখতে পেয়েছি। এ সম্পর্কে আমি আমার গ্রন্থ Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery (ইসলামী জিহাদ: জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং দাসত্বের উত্তরাধিকার)-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শুজার দাবী যে মিথ্যা সেটার প্রমাণ আমি নীচে দিচ্ছি।

আসুন আমরা দেখি মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে নবী মুহাম্মদের সম্পর্কের ধরন কেমন ছিল। জন্মস্থান মক্কা নগরে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদীনায় অভিবাসী হন। মক্কায় তার ধর্মের প্রসার থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় মদীনায় তার অনুপস্থিতিতেই পূর্ববর্তী তিন বছরে ৭৬ জন তার ধর্মের অনুসারী হয়েছিল। এইভাবে মদীনায় তার অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। অথচ মক্কায় নবুয়তের ১৩ বছর কালীন সময়ে ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ১৫০ জনের মত দাঁড়িয়েছিল।

আউস এবং খাযরাজ মদীনার এই দুইটি মুর্তি উপাসক উপজাতির সদস্যদের মধ্যে যারা তার অনুসারী হয়েছিল (৭৬ জন) তারা তাকে মদীনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি কোন গোষ্ঠী থেকে কোন প্রকার বাধা ছাড়াই মদীনায় আবাসন করেন।

এমনকি সেই সময় মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী ধনী এবং প্রভাবশালী ছিল সেই ইহুদীরাও তার কোন বিরোধিতা করে নাই। মুহাম্মদ ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মত একটা একেশ্বরবাদী ধর্ম উপস্থিত করেছিলেন এবং তাতে বহুদেবতাবাদী মূর্তি উপাসকদেরকে দীক্ষিত করছিলেন। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, এই বিবেচনা থেকে ইহুদীরা মদীনায় তার আগমনকে ভালভাবে নিয়ে থাকতে পারে।

মুহাম্মদ মদীনায় বাধাহীনভাবে তার ধর্ম প্রচার করতে থাকেন এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বহুদেবতাবাদীরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা বাধে তখন যখন তিনি আরও উচ্চাভিলাষী হয়ে ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদেরও নবী এবং ত্রাতা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। কাজেই মুহাম্মদ প্রথম দিকে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদেরকে খুশী করার জন্য তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলেন এবং তাদের অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে তিনি মুসাকে নিজের উপরেও স্থান দেন (বুখারী ৪:৬১০)।

তাদেরকে খুশী করার জন্য কুরআনের আয়াতে বলা হল আল্লাহ্ তাদেরকে তাওরাত রূপে "পথ নির্দেশ ও আলো" দান করেছেন (কুরআন- ৫:৪৪)।

ইহুদীরা হল "সৎকর্মপরায়ণ" সম্প্রদায় (কুরআন- ৬:১৫৩-১৫৪)।

"আমি তো বনী ইসরাঈলকে"... "দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর" (কুরআন- ৪৫:১৬)।

ইসলামকে যাতে ইব্রাহিমীয় ধর্মের মত দেখা যায় সেই জন্য তিনি এই প্রথম উপবাস, খৎনা, জেরুজালেমের দিকে মুখ করে উপাসনা ইত্যাদি বহু সংখ্যক ইহুদী আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি গ্রহণ করেন। ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদের এইসব ভালো কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গিমার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল সেটা পরে বেরিয়ে এসেছে। সেটা হচ্ছে ইহুদীদেরও নবী হবার জন্য মুহাম্মদের আকাঙ্খা।

সুতরাং পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ বলেন, (কুরআন- ৩:৫০):

“আর আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।”

একই কথা কুরআন- ৫:৪৮-এও বলা হয়েছে:

“আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও...।”

কিন্তু যদি তারা মুহাম্মদকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী আয়াতে (কুরআন- ৫:৪৯) আল্লাহ্ শাস্তির হুমকি দেন:

“... যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।”

প্রথমে আল্লাহ্ সনির্বন্ধ মিনতি এবং পরে শাস্তির হুমকি সত্ত্বেও ইহুদীরা মুহাম্মদকে তাদের নবী হিসাবে গ্রহণ করে নাই। বরং তারা মুহাম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত দৈব প্রত্যাদেশের বিরোধীতে পরিণত হল। কারণ তারা জানত তোরা বা তাওরাতের ভিতর কী আছে। কুরআনের মাধ্যমে তাওরাতের সবটা আনা হয়েছে মুহাম্মদের এই কথার ফাঁকি ধরাটা তাদের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। মুহাম্মদের বার্তার ভুলগুলোকে তারা খুব সহজেই দেখিয়ে দিতে পারত যা ছিল মুহাম্মদ এবং আল্লাহ্ জন্য খুবই বিব্রতকর।

পরিণতিতে আল্লাহ্ এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে, ইহুদী (এবং খ্রীষ্টান)-রা আল্লাহ্ ধর্ম

গ্রহণ করবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে বুঝাবার দায় থেকে মুক্ত করার জন্য আয়াত নাজিল করলেন (কুরআন- ২:১২০):

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্ পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।"

মুহাম্মদকে নবী হিসাবে গ্রহণ না করার জন্য মুহাম্মদ কর্তৃক ইহুদীদের ভাগ্য নির্ধারিত হল। আর সেটা হচ্ছে মদীনা থেকে তাদের নিশ্চিহ্নকরণ। শীঘ্রই (জানুয়ারী ৬২৪) মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে যখন মুহাম্মদ তার ৩০০-এর কিছু বেশী মুসলমান অনুসারী নিয়ে অনুসরণ করছিলেন তখন বদরের যুদ্ধে তার বাহিনীর তুলনায় মক্কার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং চোখ ধাঁধানো বিজয় লাভ করেন। এতে মুহাম্মদের আত্মবিশ্বাস আকাশ ছোঁয়া হল। এইবার ইহুদীদেরকে মুহাম্মদের ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল্লাহ্ প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন করার সময় এল; যেমন কুরআন- ৫:৪৯ বলছে:

"কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর, তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও, যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।"

এখন দেখা যাক, ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ কীভাবে সহিংসতা শুরু করেছিলেন। সে সম্পর্কে নবীর সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক জীবনীকার ইবনে ইসহাক বলছেন [Life of Muhammad (c. 750), Karachi, p. 363]:

“ইতিমধ্যে বানু কাইনুকার ঘটনা ঘটল। নবী তাদেরকে তাদের বাজারে জমায়েত করলেন এবং তাদেরকে নিম্নবর্ণিত কথা বললেন, ‘হে ইহুদীগণ, ঈশ্বর কুরাইশ (মক্কাবাসী)-দের উপর যে ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তা থেকে বাঁচতে হলে মুসলমান হয়ে যাও। তোমরা জান যে আমি একজন নবী, যাকে পাঠানো হয়েছে – তোমরা দেখতে পাবে যে এ কথা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে এবং তোমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অঙ্গীকার সেখানে পাবে।’ তারা প্রতিউত্তরে বলল, ‘হে মুহাম্মদ, মনে হচ্ছে যে তুমি আমাদেরকে তোমার লোক মনে করছ। নিজেকে ফাঁকি দিও না, কারণ তুমি যাদেরকে (কুরাইশ) মোকাবিলা করেছিলে তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না এবং তাদেরকে পরাস্ত করেছিলে; কিন্তু ঈশ্বরের নামে বলছি আমরা যদি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করি তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে আমরা হচ্ছি প্রকৃত পুরুষ।”

এখানে মুহাম্মদ ইহুদীদেরকে ইসলাম (অর্থাৎ তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব) গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য হুমকি দেন। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের ভাগ্যে কী আছে সে কথাও তিনি বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের কী অবস্থা হয়েছিল সেটার উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এই ভীতি প্রদর্শনমূলক আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে এ কথা বলে দিল যে যদি মুহাম্মদ তাদেরকে আঘাত করে তবে তারা প্রত্যাঘাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মুহাম্মদের হুমকির পর আল্লাহ্ নিজেই কীভাবে ইহুদীদেরকে হুমকি দিতে এগিয়ে এলেন সে কথা ইব্ন ইসহাক (পৃ: ৩৬৩) উল্লেখ করেছেন:

“ইব্ন আব্বাস থেকে ৎিক্রমা অথবা সাঈদ বিন জুবাইর থেকে যাইদ বিন থাবিতের পরিবারের একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন যে পরবর্তী জন বলেছেন নিম্নলিখিত আয়াত দুইটি (কুরআন- ৩:১২-১৩) তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল:

“১২। যারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল, ‘তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা কত

নিকৃষ্ট আবাসস্থল!"

"১৩। দুইটি দলের (বদরের যুদ্ধে) পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। একদল আল্লাহ্ পথে যুদ্ধ করিতেছিল, অন্যদল কাফির ছিল; উহারা তাহাদিগকে (এ স্থলে উহারা অর্থ কাফিরগণ ও তাহাদিগকে অর্থ মুসলমানগণ।) চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।"

যেহেতু বানু কাইনুকা ইহুদীরা উভয় হুমকিকেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল সেহেতু মুহাম্মদ এখন হুমকিকে কাজে রূপ দিবার জন্য ছুতা খুঁজছিলেন। মনে হয় মুহাম্মদ এমন কোন ছুতাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না যাতে ইহুদীদেরকে আক্রমণ করা যায়। সুতরাং ৮:৫৫-৫৮ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে মুহাম্মদের জন্য সাংঘাতিক রকম অযৌক্তিক ছুতার মাধ্যমে আক্রমণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হল। মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইহুদীরা হঠাৎ করে নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত হল:

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।" (কুরআন- ৮:৫৫)

কী শাস্তি তাদের প্রাপ্য? এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে (কুরআন- ৮:৫৪) বলা হয়েছে:

"ফিরআওনের স্বজন ও তাহাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফিরআওনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল যালিম।"

মুসাকে অস্বীকার করার জন্য ফারাও যে শাস্তি ভোগ করেছিলেন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস) মুহাম্মদকে অস্বীকার করার জন্য ইহুদীদেরও একই ধরনের শাস্তি প্রাপ্য।

ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার ছুতা বানাবার জন্য ৮:৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গের জন্য বানু কাইনুকা উপজাতিকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করলেন:

"উহাদের মধ্যে তুমি যাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ তাহারা প্রত্যেক বার তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না।" (কুরআন- ৮:৫৬)

এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, মুহাম্মদ মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন সেটা তারা বারবার ভঙ্গ করেছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ দুইবার মিথ্যাচার করেছেন: (১) মুহাম্মদ এবং ইহুদীদের মধ্যে এই ধরনের কোন চুক্তির অস্তিত্বই ছিল না; (২) যদি এটা থেকেও ছিল তবু ইহুদীরা এটা কখনই ভঙ্গ করে নাই। নীচে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা হবে।

মুহাম্মদ এবং ইহুদীদের মধ্যে কি কোন চুক্তির অস্তিত্ব ছিল?

ইহুদী এবং মুহাম্মদের মধ্যে উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি যে ছিল না সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হবে।

মুহাম্মদ এবং ইহুদীদের চুক্তির অস্তিত্বকে মুসলমানরা তথাকথিত "মদীনার সংবিধান" হিসাবে দেখাতে চায় (Ibn Ishaq, p.231-232)। মুসলমানরা এই তথাকথিত চুক্তি নিয়ে গর্ব করে। এটা তাদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের "আদর্শ নীলনকশা", যাতে ফুটে উঠেছে ইসলামী রাষ্ট্রে সকল বিশ্বাসের মানুষের জন্য সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচারের মর্মবাণী। এই চুক্তিটি মদীনায় মুহাম্মদের অভিবাসনের এক বছর সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এই চুক্তি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মদীনায় নূতন উদ্বাস্তু মুহাম্মদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের নিকট সকল মদীনাবাসীর শর্তহীন অধীনস্ততা দাবী করা হয়। আমি প্রমাণ করব যে, এই চুক্তিতে ইহুদীরা কখনই স্বাক্ষর করে নাই এবং সম্ভবত এটা তারা কখনই দেখেও নাই।

এই চুক্তির কথাগুলি এইভাবে শুরু হয়েছিল: “করুণাময়, দয়ালু ঈশ্বরের নামে। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (নবী) মুহাম্মদ হতে কুরাইশ ও ইয়াথরিবের (মদীনা) বিশ্বাসী ও মুসলমানদের, এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছিল এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে শ্রম দিয়েছিল তাদের মধ্যকার দলিল।”

এবং এটা শেষ হয়েছিল এই কথাগুলো দিয়ে: “ঈশ্বর এই দলিলকে অনুমোদন করেন।... মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (অর্থাৎ নবী)।”

আল্লাহ্‌ এবং মুহাম্মদ উভয়ের যেসব কথা উপরে বলা হয়েছে তা থেকে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, ইহুদীরা কখনই ইসলাম গ্রহণ করতে এবং মুহাম্মদের নেতৃত্বের নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারত না এবং কখনই তারা মুহাম্মদকে একজন নবী হিসাবে গ্রহণ করতে পারত না।

তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, যেখানে দুইবার বলা হয়েছে এই দলিল ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা নবী মুহাম্মদ হতে সেই দলিলে ইহুদীরা স্বাক্ষর দিবে?

এই দলিলে সই করার অর্থ হচ্ছে ইহুদীরা মুহাম্মদের নবীত্বকে মেনে নিয়েছে। অথচ তারা লাগাতারভাবে সব সময়েই এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মদের এই দাবী ছিল তাদের কাছে তামাশার বিষয়। এমনকি মুহাম্মদের হাতে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনই মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নাই। অতএব এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইহুদীরা কখনই এই দলিলে স্বাক্ষর করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মন্টেগোমারী ওয়াট-এর মতে (মুসলমানদের প্রিয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যার বিভিন্ন বই পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে): “এই দলিলে নয়টি চুক্তিবদ্ধ পক্ষ ছিল; তারা ছিল মক্কার মুসলিম উদ্বাস্তু এবং নূতন মুসলমান আরব উপজাতিসমূহ (অ-ইহুদী), যারা মুহাম্মদ কর্তৃক মদীনায় আগমনের পর ব্যাপক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কোন ইহুদী উপজাতি এই দলিলে স্বাক্ষর করে নাই।” (Watt M, Islam and the Integration of Society, 1961, p.19)

এই চুক্তির কথা দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এটা ছিল ইহুদীসহ মদীনার অন্য সকল উপজাতির প্রতি মুহাম্মদের অধীনে সমবেত হওয়ার এবং তার আদেশ অনুসরণ করে চলার জন্য মুহাম্মদের আমন্ত্রণ। এটা রচনায় ইহুদীদের কোন অংশ বা ভূমিকাই ছিল না। খুব সম্ভবত এটা ছিল মুহাম্মদ এবং মদীনার মূর্তি উপাসক থেকে মুসলমানে পরিণত হওয়া উপজাতিগুলির মধ্যকার গোপন সমঝোতার দলিল যে উপজাতিগুলির ইহুদী উপজাতিগুলির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মৈত্রী ছিল। আর এই উপজাতিগুলির সঙ্গে ইহুদী উপজাতিগুলির পূর্ব থেকেই আনুষ্ঠানিক মৈত্রী থাকলেও তারা সম্ভবত কখনই এই দলিল চোখে দেখে নাই।

ইহুদীরা কি কোন চুক্তি ভঙ্গ করেছিল?

যদি কোন চুক্তি থেকেও থাকে তবুও ইহুদীরা এটা কখনও ভাঙ্গে নাই। আল্লাহ্ যেভাবে বারংবার চুক্তিভঙ্গের জন্য ইহুদীদের প্রতি দোষারোপ করছেন সেভাবে বারংবার তো দূরের কথা একবারও তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নাই। ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার জন্য আল্লাহ্ মুহাম্মদকে যে আয়াত দ্বারা নির্দেশ করেছিলেন সেটা থেকেই এটা স্পষ্ট (কুরআন- ৮:৫৮):

“যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।”

এই আয়াত হচ্ছে বানু কাইনুকা উপজাতিকে আক্রমণের জন্য আল্লাহর সরাসরি আদেশ। প্রথম যে ইহুদী উপজাতির উপর মুহাম্মদের তরবারি নেমে এসেছিল তারা হল বানু কাইনুকা উপজাতি। আল-তাবারি কর্তৃক উদ্ধৃত আল-জুহ্রির বিবরণ অনুযায়ী ফেরেশতা জিবরাইল মুহাম্মদের নিকট একটি আয়াত আনয়ন করেন, যাতে বলা হয়েছে (History of Al-Tabari, New York, V11:86):

"যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে' (কুরআন- ৮:৫৮)। যার ফলে মুহাম্মদ বললেন, 'আমি বানু কাইনুকাকে ভয় করি' এবং 'ঈশ্বরের বার্তাবাহক তাদেরকে আক্রমণ করেন।"

এই আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ যেহেতু মুহাম্মদের এই ভয়ের উল্লেখ করছেন যে চুক্তি ভঙ্গ হতে পারে সেহেতু তিনি বানু কাইনুকাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ যেভাবে বলেছিলেন যে অনেকবার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল সেই অনেকবার তো দূরের কথা তখন পর্যন্ত তারা একবারও চুক্তি ভঙ্গ করে নাই।

বস্তুত ইহুদীদেরকে কেন আক্রমণ করতে হবে সেটা পরিষ্কার হয় পরবর্তী আয়াত দ্বারা (কুরআন- ৮:৫৯):

"কাফিরগণ কখনও মনে না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে; নিশ্চয়ই তাহারা মুমিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না।"

স্পষ্টতই ইহুদীরা আল্লাহর পরিকল্পনাকে বানচালের চেষ্টা করছিল। মুহাম্মদের মাধ্যমে পাঠানো ওহীর উপর ইহুদীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট বহু আয়াতের মাধ্যমে সনির্বন্ধ মিনতি করেছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা মুহাম্মদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর এইসব আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু তারা এগুলি নিয়ে তামাশাও করত। ইহুদীরা এই সকল ওহীর মধ্যে এতসব অসঙ্গতি ও ত্রুটি খুঁজে পেত যা আল্লাহ্-মুহাম্মদ উভয়ের জন্য ছিল বিব্রতকর।

তাদের কতখানি স্পর্ধা! এই রকম এক বিরাট অপরাধের জন্য তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি হওয়া উচিত। আল্লাহ্ হুকুম দিলেন, তাদেরকে রেহাই পেতে দেওয়া যাবে না।

সংক্ষেপে, মুহাম্মদ ইহুদীদেরকে এই জন্য আক্রমণ করেন নাই যে, তারা ইতিপূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, বরং এই আশঙ্কা থেকে আক্রমণ করেছিলেন যে, বানু কাইনুকা

উপজাতি ভবিষ্যতে কোন সময় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে। এই ভয় থেকে মুহাম্মদ বানু কাইনুকা উপজাতিকে অবরোধ করেন। পনের দিন অবরোধের পর ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করল। কুরআনের ৫:৪৯ আয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবার এবং ৮:৫৪ আয়াতে তাদেরকে ফারাওয়ের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই অনুযায়ী শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আত্মসমর্পিত ইহুদী পুরুষদেরকে দ্রুত হত্যার জন্য বেঁধে ফেলেন। এই পর্যায়ে ইসলামে মুনাফিক হিসাবে নিন্দিত আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইয়ী দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রধান, যিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও ছিলেন মানবিক হৃদয়ের অধিকারী। এমনকি তিনি মুহাম্মদকে এই বলে হুমকি দেন যে, ইহুদীদেরকে হত্যা করলে তার ফল মোটেই ভাল হবে না। এর ফলে মুহাম্মদ বিচক্ষণতার সঙ্গে বন্দীদের হত্যা করা থেকে বিরত হলেন। হত্যার পরিবর্তে মুহাম্মদ তাদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন (Ibn Ishaq, p. 363-64) ।

আরেকটি হাদীসে ইহুদীদের বিরুদ্ধে হুমকির স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে (বুখারী ৯:৮৫:৭৭):

"আবু হুরাইরা বর্ণনা করছেন: আমরা যখন মসজিদে ছিলাম তখন আল্লাহ্ নবী (মুহাম্মদ) আমাদের কাছে এসে বললেন, 'চলো, ইহুদীদের দিকে অগ্রসর হই।' সুতরাং আমরা তার সঙ্গে বায়িত-আল-মিদরাস-এ (যেখানে তাওরাত পাঠ করা হত এবং সকল ইহুদী একত্র হত) গেলাম। নবী তাদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে সমবেত ইহুদীগণ! ইসলাম গ্রহণ কর এবং তোমরা নিরাপদ হবে।' ইহুদীরা উত্তর দিল, 'হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্ বার্তা আমাদেরকে জানিয়েছ।' নবী বললেন, 'আমি এটাই চাই (তোমাদের কাছ থেকে)।' তিনি দ্বিতীয়বার প্রথমটি কথাটিই আবার বললেন, এবং তারা বলল, 'তুমি আল্লাহ্ বার্তা আমাদেরকে জানিয়েছ, হে মুহাম্মদ।' তিনি তখন তৃতীয়বারের মত এই কথাটি আবার বললেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত করলেন, 'তোমাদের জানা উচিত যে এই পৃথিবী আল্লাহ্ এবং নবীর। আমি তোমাদেরকে এই ভূমি থেকে নির্বাসন দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের কিছু সম্পত্তি আছে

তোমরা তা বিক্রি করতে পার, অন্যথায় তোমাদের জানা উচিত যে পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তার নবীর।"

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, ইহুদীরা কখনই কোন সময়ের জন্য প্রথমে কোন মুসলমানকে আক্রমণ করে নাই। যেভাবে মুসলমানরা দাবী করে যে, মুহাম্মদ আত্মরক্ষার জন্য ইহুদীদেরকে আক্রমণ ও উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটা মোটেই সত্য নয়। মুসলমানরা অতি সাধারণ যুক্তি হিসাবে যে চুক্তিভঙ্গের কথা বলে সেই ধরনের কোন কাজও ইহুদীরা কখনই করে নাই। এমনকি সম্ভবত চুক্তিটির অস্তিত্বই কখনও ছিল না। কাজেই ইহুদীদেরকে আক্রমণ করার পিছনে মুহাম্মদের কোন যৌক্তিকতাই ছিল না। ইহুদীদের উপর মুহাম্মদের আক্রমণ, তাদের উৎসাদন এবং এমনকি পাইকারী হত্যা ও দাসকরণ ছিল ইতিহাসের অসমর্থনীয় চরমতম বর্বরতার এক দৃষ্টান্ত।

(নিবন্ধটি M. A. Khan-এর Did Muhammad Evict the Jews of Medina for Attacking and Killing Muslims?-এর বাংলায় ভাষান্তর। ইংরাজী নিবন্ধটি লেখক কর্তৃক ইসলাম ওয়াচ (http://www.islam-watch.org)-এ তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নিবন্ধের সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত রূপ যা লেখক অনুবাদের জন্য বঙ্গরাষ্ট্র-এ পাঠান। এম, এ, খান Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery নামক গ্রন্থের লেখক। কুরআনের আয়াতগুলির বাংলা অনুবাদ লেখকের ইংরাজী অনুবাদ থেকে না করে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" কৃত বঙ্গানুবাদ "আল-কুরআনুল করীম" থেকে নেওয়া হয়েছে।)

মুসলিম মানসের যৌন বিকৃতি

এম, এ, খান

মুসলমান পুরুষের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই বিকৃত যে, তারা মনে করে যে এমনকী শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েও তারা নারীকে ধর্ষণ করতে পারে। এটা কীভাবে সম্ভব তা আমরা ধারণা করতে পারি না। তবে কেন তারা এ ধরনের বিকৃত চিন্তা লালন করে তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা যায়।

অনেক সময় আমি মুসলমানদের কাছ থেকে ইমেইল পেয়ে থাকি। মনে হয় তারা উচ্চ শিক্ষিত। তারা পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকেন এবং ভাল ইংরেজি লিখেন। তারা বোরখা পড়ার ইসলামি রীতির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, এতে নারীরা বেগানা পুরুষ কর্তৃক 'দৃষ্টি দ্বারা ধর্ষিত' হবার হাত থেকে রক্ষা পায়। নীচে ফাররুখ আবিদি নামের তেমন এক ব্যক্তির একটি চিঠি তুলে ধরা হল। সম্ভবত তিনি সাম্প্রতিক 'এঙ্গাস রিড জরিপ'-এর ফলাফল দেখে চিঠিটা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ওই জরিপে দেখা গেছে কুইবেগ এবং কানাডার অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, বোরখা বা নেকাব পড়া মহিলাদের সরকারি সেবা, হাসপাতালের পরিচর্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আবিদি লিখেছেনঃ

"আসসালামু আইলাইকুম,

অমুসলিম দেশগুলো যদি হিজাব অথবা নিকাব নিষিদ্ধ করে তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। কারণ তারা অমুসলিম। তারা ইসলামি মূল্যবোধের পরোয়া করে

না। কিন্তু যখন অধিকাংশ মুসলিম নারী নিকাব অথবা হিজাব পরিধান করে না, এবং অধিকাংশ মুসলিম পুরুষ তাদের স্ত্রীরা আল্লাহর এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মানলো কী মানলো না, সে ব্যাপারে নির্লীপ্ত থাকে তখন সত্যিই অবাক হতে হয়। এমন শত শত মুসলিম পরিবার আছে যেখানে নিকাব অথবা হিজাব পড়ে এমন মহিলা একজনও পাওয়া যাবে না।

শুধু তাই নয়, মুসলিম নারীরা এখন অনাবৃত থাকার শিক্ষাও বেশ ভালোভাবে নিয়েছে। মহিলারা এখন হাতাকাটা জামা পড়ছে। অনেক মুসলিম নারী এমনভাবে শাড়ী পড়েন (বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানে), তাদেরকে অর্ধনগ্ন দেখায়। অনেক নারী এখন বুকে কাপড় না দিয়ে তা অনাবৃত রাখে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মুসলমান পুরুষরা বুঝে না যে তাদের স্ত্রীরা এভাবে বের হলে বহু মানুষ তাদের শরীরের অনাবৃত অংশ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে অমুসলিম দেশগুলোতে খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, শিখ, ধর্ষণকারী, মদ্যপ, গুণ্ডাপাণ্ডা, রাস্তার বখাটে ছোকড়া, সমকামী ইত্যাদি হরেক রকমের মানুষ আছে। তারা লোলুপ দৃষ্টিতে এ ধরনের মুসলিম যুবতী ও কিশোরীদের দিকে তাকায়, উত্তেজিত হয়; এদের নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে।

এই মুসলমান পুরুষদের আক্কেলজ্ঞান কতটুকু তা আপনি কল্পনা করতে পারেন? অধিকাংশ মুসলমান পুরুষ তাদের স্ত্রীদের হিজাব না পড়ার অনুমতি দিয়ে এবং শরীর উন্মুক্তকারী পোশাক পরার স্বাধীনতা দিয়ে নিজেদের অজান্তে সব ধরনের মানুষকে উত্তেজিত হওয়ার এবং সুখানুভূতি পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

মহিলারা আসলে পুরুষদের চরিত্র বোঝে না। তাই তারা শরীর উন্মুক্তকারী পোশাক পরে। জানে না যে এতে করে সব ধরনের মানুষ তাদের কাছ থেকে মজা লুটছে। আমি জানি তাদের কেউ কেউ হিজাব পড়ে না পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মহিলারা স্বামীর কথা মানে। যদি স্বামীরা নিজ নিজ স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করে তবে আমি নিশ্চিত যে ৯০% বিবাহিত নারী হিজাব পড়া শুরু করবে।

যেসব মুসলিম নারী হিজাব পড়ে না তাদের জীবনের মর্যাদা নাই। শুধু তাদের স্বামীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা অমর্যাদাকর জীবন বেছে নিয়েছে। তাহলে তাদের স্বামীরা সন্তুষ্ট হলে তারা কেন মর্যাদাকর জীবন বেছে নিবে না?

মুসলমান পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের এই বিব্রতকর অবস্থা কীভাবে সহ্য করে তা চিন্তা করে আমি সত্যিই অবাক হই।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম জাহানের সর্বত্র মুসলমানরা বিস্মিত হয়ে অভিযোগ করে, 'অমুসলিম দেশগুলো কেন আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না?'

কেন তারা করবে? আমরা কি ইসলামী মূল্যবোধকে কোনরকম গুরুত্ব দিচ্ছি?

জাযাকাল্লাহ্
ফাররুখ আবিদি।"

আমি শুধু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত না থাকলে কীভাবে একজন নারী চোখের দেখায় ধর্ষিত হতে পারে, অর্থাৎ একজন বেগানা বা বাইরের পুরুষ কেবলমাত্র চোখ দিয়ে দেখে কীভাবে তাকে সম্ভোগ করতে পারে!

যদিও মুসলমানরা অভিযোগ করে, (আবিদি যেমন করেছেন) অমুসলমানদের এমন বিকৃত যৌন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এটা আসলে তাদের অন্তরের এই চিন্তাকেই প্রকাশ করে, কোন নারীর অনাবৃত মুখ, হাত, পা, অথবা বুকের অংশবিশেষের দিকে তাকিয়ে চোখ দ্বারা তাকে ধর্ষণ করা সম্ভব। আমি ৩৫ বছর মুসলমান ছিলাম, তাই আমি এতে অবাক হই না।

একজন সিরিয় আরব এবং সাবেক মুসলমান মুমিন সালিহ্ মুসলমানদের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে বর্ণনা করে লিখেছেনঃ

উপসাগরীয় দেশগুলোতে এবং আরো কয়েকটি মুসলিম দেশে চালু থাকা কঠোর যৌন বিচ্ছিন্নতার ফলে কতিপয় মুসলমান যৌনতা তাড়িত পশুর মত আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ সৌদি আরবে কালেভদ্রে কোন নারীর অনাবৃত পা দেখে ফেললে পুরুষদের মনে যৌন উত্তেজনা জাগতে পারে। অস্ট্রেলিয় ইমাম তাজ-আল-হিলালী আংশিক অনাবৃত মহিলাকে অনাবৃত মাংসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা দেখলে খাওয়ার জন্য জিহ্বায় পানি এসে যায়।

আমি জানি ইসলামী দেশগুলোর তরুণ মুসলমানরা হঠাৎ করে কোন নারীর ব্রেসিয়ারের ফিতা দেখে ফেললে তাদের শরীর কীভাবে গরম হয়ে উঠে। এতে বোঝা যায় অনাবৃত উরু অথবা স্তনের অংশ দেখলে মুসলমানদের কী দশা হতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, সাধুতার মুখোশের আড়ালে মুসলমানরা উন্মাদের মত পর্নোগ্রাফি উপভোগ করে।

এটা স্বাভাবিক যে রক্ষণশীল সামাজিক পটভূমির পুরুষরা, যেখানে নারী-পুরুষের মেলামেশা মুসলিম দেশগুলোর অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে সীমিত, কোন মেয়ের শরীরের অংশবিশেষ কিছুটা অনাবৃত দেখলেও সহজেই যৌন উত্তেজনা বোধ করে। তবে কোন সমাজ অথবা এর ধর্মীয় বিশ্বাস যৌনতা ও নারীকে কী দৃষ্টিতে দেখে তার ভিত্তিতেও বিকারগ্রস্ত যৌন মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে। মানুষ হিসাবে আমরা কিংবদন্তীতূল্য দানবীর হাতেম তাইয়ের মত হয়ে উঠতে পারি, আবার তার সময়কার নবি মুহাম্মদের মত লুটেরা এবং ডাকাতও হয়ে উঠতে পারি (উল্লেখ্য, মুহাম্মদ হাতেম তাইয়ের গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট এবং হাতেমের সন্তানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন)। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনোভাব গড়ে ওঠে আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আমরা এগুলোকে কীভাবে পরিচর্যা করি তার নিরিখে।

মুসলমানরা সর্বোত্তমভাবে বড়জোর তাদের নবির মতো হতে পারে। সর্বকালে জীবনের সব দিক থেকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্ত হিসাবে মুহাম্মদকে

মুসলমানরা দেখে থাকে। এই লেখায় নবির একটি সুন্নতের উল্লেখ করছি। এতে বোঝা যাবে মুসলমানরা কেন নারী এবং যৌনতার ব্যাপারে এমন বিকৃতমনস্ক।

নবি একদিন তার পালকপুত্র যায়িদের বাড়িতে গেলেন। যায়িদ তখন বাইরে ছিলেন। তিনি যখন যায়িদকে নাম ধরে ডাকলেন তখন তার নব বিবাহিত স্ত্রী যয়নব ভিতর থেকে জানালেন যে যায়িদ বাড়ীতে নাই। কিন্তু মুহাম্মদ তার কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে না গিয়ে তিনি যায়িদের বাড়ীর ভিতরে উঁকি দিলেন। সেখানে তিনি তার পুত্রবধূ যয়নবকে দেখলেন। আরবের গ্রীষ্মকালীন গরমের দিনে যয়নব তখন ফিনফিনে পোশাক পরা অবস্থায় ছিলেন। মুহাম্মদ সুন্দরী যয়নবের আকর্ষণীয় প্রায় নগ্ন শরীর দেখে মোহিত হয়ে পড়লেন। তিনি এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যিনি হৃদয়ের অনুভূতি পরিবর্তন করতে পারেন।"

এরপর যা ঘটেছিল তাতে যে কোন সুন্দর মনের মানুষ বিষণ্ন বোধ করবেন, যদিও মুসলমানরা এটাকে নবির চির অনুসরণযোগ্য পবিত্র ঐতিহ্য বলে গণ্য করেন। সুন্দর মনের কোন শ্বশুর হলে পুত্রবধূর ঘরের ভিতর উঁকি দেওয়ার মতো ভুল করার জন্য লজ্জা পেয়ে ফিরে যেতেন। তার পরিবর্তে মুহাম্মদ সম্ভবত সুন্দরী যয়নবের যৌনাবেদনময়ী শরীর দেখে নিজের শরীরের ভিতর যৌনতার মহাপ্লাবন অনুভব করেছিলেন। এবং কীভাবে তিনি জীবনে একবার আসা যৌন উত্তেজনাকে বশে এনেছিলেন? এখানে সম্ভবত সে কাহিনীই বলা হয়েছেঃ

সহি মুসলিম ৮নং পুস্তক, সংখ্যা ৩২৪০

জাবির জানিয়েছেন যে, "আল্লাহর নবী (সঃ) একজন মহিলাকে দেখেছিলেন, এবং তাই তিনি যয়নবের কাছে ফিরে এসেছিলেন। যয়নব তখন একটি চামড়া পাকা করছিলেন, তিনি তার সঙ্গে রতিক্রিয়া করলেন। তিনি তখন তার সাথীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, নারী শয়তানের আকৃতিতে আসে এবং চলে যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ কোন মহিলাকে দেখলে নিজের স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে;

কারণ এতে তার চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হবে"।

ইসলামী সাহিত্যে সম্ভবত এই কাহিনীর সঙ্গে যয়নবের বিষয়ে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ ঘটনার সময় হচ্ছে নবীর সঙ্গে জয়নাবের প্রথম সাক্ষাতের পর। সে সময় নবির অভ্যাস ছিল মদীনার বিভিন্ন ঘরের ভিতর মহিলারা কী অবস্থায় আছে তা উঁকি দিয়ে দেখা (এতে যে তিনি আরও নিকৃষ্ট বিকৃতমনা মানুষে পরিণত হন তা নয় কি?)। মজার ব্যাপার হচ্ছে অর্ধনগ্ন যয়নবকে দেখার পর তার মধ্যে যে যৌন উত্তেজনা হয়েছিল সেটা মেটানোর জন্য তিনি একই নামের স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় গিয়েছিলেন। এ সময় কী তার মনে হচ্ছিলো যে তিনি তার পুত্রবধু যয়নবের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করছেন?

এছাড়া আমরা নবির চরম যৌন বিকৃতি সম্পর্কেও জানি। তাঁর অনিয়ন্ত্রিত বহুগামিতা, ছোট বালিকা আয়িশাকে পাওয়ার জন্য তাঁর লালসা এবং ৯ বছর বয়সে যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের উপযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত আয়িশার পিছনে লেগে থাকা এবং তার সঙ্গে উরু মৈথুন করা, যুদ্ধে বন্দী করে 'কাফের' মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীকে সে রাতেই নিজের বিছানায় নিয়ে যাওয়া,বাবা খবর পাঠিয়েছে এই মিথ্যা কথা বলে নিজের স্ত্রী আসমাকে তাঁর বাবা ওমরের বাড়ীতে পাঠিয়ে তাঁরই বিছানায় তরুণী দাসী মারিয়াকে নিয়ে রাত্রিযাপন ইত্যাদি সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়।

এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে মুহাম্মদের সঙ্গে যয়নবের মুলাকাত সেখানেই শেষ হয় নি। তিনি সব ধরনের কৌশল খাটিয়েছেন; এমনকী তাঁর পালক পুত্রের স্ত্রী যয়নবকে নিজের স্ত্রী বানানোর জন্য আরব ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আল্লাহর সাহায্য নিয়েছেন। তৎকালীন আরব সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ ছিল।

যখন মুসলিম মানসে এই নবি সর্বকালের জন্য যৌন কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে শুদ্ধতার ভাবমূর্তি নিয়ে অবস্থান করেন, তখন এটা বুঝতে সহজ হয় যে,

কেন মুসলিম পুরুষরা উদার পোশাক পরা মহিলাদের দৃষ্টির মাধ্যমে ধর্ষণ করা সম্ভব বলে মনে করে। যেন কোন মহিলার পা,হাত,মুখ,অথবা বুকের কিছু অংশ দেখে তারা চরম যৌনতৃপ্তি লাভ করে।

উপরোল্লিখিত হাদীসে নবীর যৌন বিকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে, ইসলামে একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে কী? তিনি নিকটবর্তী এক বাড়ীতে এক অর্ধনগ্ন মহিলাকে দেখে যৌন উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়লেন এবং বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে কোন রকম প্রশ্ন না তুলে আকস্মিকভাবে তার যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করতে হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে আমরা কাফেররা স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। প্রায়ই সে ক্লান্ত থাকে, তার মন ভাল থাকে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং এই একই পরিস্থিতিতে আমরা যদি যৌনকর্মের জন্য চাপাচাপি করি তবে নিশ্চিতভাবে আমাদের চিরদিনের জন্য ছুঁড়ে ফেলা হবে।

যখন একটি সমাজ অথবা জনগোষ্ঠীর যৌন নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে উঠে এই থেকে যে, মহিলারা পুরুষের যৌন ক্ষুধা মেটানোর হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়, তখন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কেন মুসলমানরা মহিলার শরীরের উন্মুক্ত অংশের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি দিয়ে তাকে ধর্ষণ করা যায় বলে মনে করে। এই বিকৃত যৌনভাবনা থেকে আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন পশ্চিমা দেশগুলোতে গিয়েও মুসলমানরা অন্যান্য অভিবাসীদের মত (যেমন ভারত থেকে আগত হিন্দু) উদার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যৌনতা ও নারী সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পাল্টাতে পারেন না।

এটা বাস্তব সত্য যে, মুসলমানদের বিকৃত যৌন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মহিলারা মুসলিম দেশগুলোতে বাজারে, রাস্তায়, শপিংমলগুলোতে এবং যে কোন জনাকীর্ণ স্থানে যৌন হয়রানীর শিকার হয়। এবং তারা পশ্চিমা দেশগুলোতে আসার পরও পবিত্র ঐতিহ্য দ্বারা লালিত হওয়ার কারণে মহিলাদের প্রতি তাদের এই মনোভাব পাল্টাতে পারে না। সুযোগ পেলেই তারা মহিলাদের ধর্ষণ এবং হিংসাত্মক আক্রমণের মত একই

ধরনের যৌন আচরণ করে থাকে। সিডনী, মালমো (সুইডেন)-এর মুসলমান প্রধান মহল্লাগুলোতে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় শ্বেতাঙ্গ নারীদের ধর্ষণ করার হার যে অনেক বেশী এ প্রসঙ্গে সে কথা স্মরণ করা যায়। কতিপয় মুসলমান মোল্লা এমনকী ওইসব ধর্ষণের ঘটনাকে গর্বের সঙ্গে সমর্থনও করেন। তারা উদার পোশাক পড়া মহিলাদের মাংসের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, তারাই প্রকৃত অপরাধী। এবং আপনি যদি মুসলমান হন এবং মুসলমান পুরুষদের আলাপচারিতা শুনে থাকেন তবে দেখবেন, তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এমন এক ধারণা রয়েছে যে- পাতলা পোশাক পরা কাফের নারীরা বেশ্যা এবং তাদের ধর্ষণ করা উচিত।

কেন মুসলমান পুরুষরা মনে করেন তারা কোন নারীর শরীরের অনাবৃত অংশের দিকে তাকিয়ে তাকে ধর্ষণ করতে পারে, আশাকরি এখন আর তার কারণ খুঁজে পেতে পাঠকদের কষ্ট হবে না।

(নিবন্ধটি M. A. Khan -এর Sexual Perversity of the Muslim Mind -এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরেজি লেখাটি ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)-এ ১৫ জুন ২০১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। লেখক ওয়েব সাইট 'ইসলাম ওয়াচ'-এর সম্পাদক এবং Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery নামক গ্রন্থের লেখক)

আরও বড় অপরাধী ইসলামকে ছেড়ে ইউরোপীয় দাস ব্যবসার নিন্দা করা

এম, এ, খান

প্রেসিডেন্ট ওবামা ঘানায় যখন দাস-দুর্গ পরিদর্শন করছিলেন তখন তিনি দাস প্রথাকে নিন্দা করতে গিয়ে, ভূগর্ভস্থ দাসদের কারাকক্ষের নিকটবর্তী গীর্জার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন কীভাবে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা গীর্জার বৈধতা নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে দাস বানিয়ে ব্যবসা করেছিল, যেন এটা ছিল ইতিহাসের একমাত্র দাস প্রথা এবং নিন্দনীয় হবার যোগ্য। কিন্তু ইসলাম, যার ভূমিকা দাস প্রথা প্রবর্তন এবং অনুশীলনে অনেক বেশী নিষ্ঠুর এবং অনেক বেশী বেদনাদায়ক, সেটাকে এখন পর্যন্ত আলোচনায়ই আনা হয় না যেন দাস প্রথার ত্রুটি ইসলাম এবং তার অনুসারীদের মধ্যে কখনও ছিল না অথবা নাই।

সাধারণ মানুষ এ কথা মনে করে যে, কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে দাস প্রথা ইতিহাসের একমাত্র দাস প্রথা যার দ্বারা ইউরোপীয় বণিকরা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদেরকে বন্দী করে নূতন পৃথিবীতে (উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) চালান দিত।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ কথা বলবেন। আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী একজন মুসলিম যুবক আমাকে লিখেছিলেন, "আপনি কি জানেন কীভাবে আমেরিকার দাস শিকারীরা আফ্রিকায় গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে বন্দী করে এবং দাস বানিয়ে আমেরিকায় এনেছিল? এই দাস শ্রম আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষমতা গঠনে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।"

“নেশন অব ইসলাম”-এর লুই ফারাখান আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া এই দাস ব্যবসাকে “সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে নিষ্ঠুর দাস প্রথা” বলে উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি বলেছেন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা জানে না যে, অতীতে “আমাদের (কৃষ্ণাঙ্গদের) প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই তারা আজকের এই সুবিধাজনক অবস্থা ভোগ করছে”।

মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগুরু অংশ বিশ্বাস করে যে, ইসলামের ইতিহাস এই দাসত্বের ঘৃণ্য ব্যবস্থা হতে মুক্ত। রকি ডেভিস (ওরফে শহীদ মালিক) যিনি কি-না ইসলাম গ্রহণকারী একজন অস্ট্রোলীয় আদিবাসী, তিনি A. B. C. রেডিওকে বলেন যে, “ইসলাম নয়, খ্রীষ্টধর্মই হচ্ছে দাস ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা।”

সত্যি কথা বলতে কী একজন মুসলমান হিসাবে ৩৫ বছর ধরে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা বুঝেছি, সেটা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিরোধী যে তীব্র ঘৃণা রয়েছে সেটার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে এই বিশ্বাস।

ভারতে মুসলমানরা উপমহাদেশে দাস ব্যবস্থার চর্চা নিয়ে যখন কথা বলে তখন তারা পর্তুগীজরা গোয়া, কেরালা এবং বাংলার উপকূলীয় এলাকা থেকে কীভাবে মানুষদেরকে দাস হিসাবে বন্দী করে নিয়ে যেত শুধুমাত্র তার হৃদয় বিদারক ও লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করে।

কিন্তু যখন আমি অনুসন্ধান করি তখন মুসলমানরা যেভাবে দাস ব্যবস্থাকে অনুশীলন করেছিল তার ভয়াবহতা জেনে বিস্ময়ে অভিভূত হই। আমি দেখতে পাই যে, আল্লাহ ও নবী কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত দাস ব্যবস্থা ছিল আরও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর এবং সেটা ছিল আরও অনেক ব্যাপকতর আয়তনে পরিচালিত। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery (ইসলামী জিহাদ: জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং দাসত্বের উত্তরাধিকার) নামক আমার সাম্প্রতিক লেখা গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

এটা শুভ লক্ষণ যে, ১১ জুলাইতে ঘানার একটি প্রাক্তন দাস ব্যবসার দুর্গ পরিদর্শন করে প্রেসিডেন্ট ওবামা মানব ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়টিকে এক "বিরাট পাপ" হিসাবে নিন্দা করেন। এবং তিনি আরও বলেছেন "যারা আফ্রো-আমেরিকান তাদের নিকট এই জায়গার একটি বিশেষ অর্থ আছে ..... এটা ছিল তাদের জন্য এক গভীর বেদনার জায়গা।"

কীভাবে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা গীর্জার বৈধতা নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের দাস বানিয়ে ব্যবসা করেছিল সেই বিষয়টা সপষ্ট করার জন্য ওবামা দাসদের রাখবার জন্য ভূগর্ভস্থ বন্দীগৃহের পার্শ্ববর্তী একটি গীর্জার প্রতি দিক নির্দেশও করেছিলেন ।

এই ধরনের জনপ্রিয় ধারণাগত কাঠামো দাস ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে আমলে নেয় না:

(১) কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যবস্থা ইতিহাসের একমাত্র দাস ব্যবস্থা নয়। আরব, তুর্কী, ভারতীয় এবং এমনকি লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়রা একই সময় অথবা তার আগে থেকেও দাস ব্যবস্থার শিকার হয়েছিল। এই দাস ব্যবস্থার একটি অংশ ছিল যৌন দাসত্ব এবং খোজাকরণ। এবং এই কাজগুলো যারা করত তারা কিন্তু ইউরোপীয় ছিল না, বরং ছিল মুসলমান ।

(২) কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের শুধুমাত্র যে নূতন পৃথিবীতে পাঠানো হত তা-ই নয়, বরং তাদের এক বৃহত্তর অংশকে মুসলিম পৃথিবীতে পাঠানো হত।

(৩) এমনকি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া যে দাস ব্যবসা ছিল সেখানেও মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে নির্মম।

ইসলামী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বয়ং নবী মুহামমদ দৈব প্রত্যাদেশ দ্বারা (কুরআন ১:৭৬, ৩০:২৮, ১৬৩:৭১, ৭০:২৯-৩০, ২৩:৫-৬, ৩৩:৫০ ইত্যাদি)× বৈধতা প্রাপ্ত হয়ে বহু সংখ্যক আরব উপজাতি (কুরাইযা, খাইবার, মুসতালিক এবং

হাওয়াযিন ইত্যাদি)-এর নারী এবং শিশুদেরকে দাস বানিয়ে ইসলামী দাস প্রথার সূচনা ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামী ক্ষমতার দ্রুত বিকাশের সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শক্তি ও গতি নিয়ে পৃথিবী পরিসরে দাস ব্যবস্থার বিশাল বিস্তার ঘটে। মুসলমানরা যেখানেই বিজয় লাভ করেছে সেখানেই বিপুল সংখ্যায় নারী এবং শিশুদেরকে দাস বানানো হয়েছে। সেনাপতি মূসা ৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকা জয় করে সেখানে তিন লক্ষ মানুষকে দাস করেছিলেন, এবং ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন স্পেন জয় করে প্রত্যাবর্তন করেন তখন লুটের মালের ভিতর এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে খলিফার যে প্রাপ্য ছিল তাতে কেবলমাত্র ভিসিগথ অভিজাত পরিবারসমূহের শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের সংখ্যাই ছিল ৩০,০০০। আর সুলতান মাহমুদ ১০০১-২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ অভিযান শেষে সঙ্গে করে নিয়ে যান ৫ লক্ষ নারী ও শিশুকে দাস হিসাবে। এই বর্ণনাটি ভাসমান হিমশৈলের জলের উপরে অবস্থিত সামান্য অগ্রভাগের চিত্রকেই মাত্র তুলে ধরে।

ইউরোপীয়রাও ইসলামী দাস ব্যবস্থার কম শিকার ছিল না। মুহামমদের মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যেই ভূ-মধ্যসাগরের দ্বীপগুলি ইসলামী আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। এই ধারা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এমনকি তুরস্কের অটোমানরা ১৬৮৩-খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে যখন পশ্চাদপসারণ করে তখন তারা পালানোর সময়েও সঙ্গে করে নিয়ে যায় দাস-দাসী হিসাবে ৮০,০০০ শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে। আর বার্বারি (উত্তর আফ্রিকান) জলদস্যুরা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হানা দিয়ে উত্তর আফ্রিকার উপকূলবর্তী ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি থেকে এবং ইউরোপের উপকূলীয় গ্রাম এবং দ্বীপ সমূহ থেকে ১৫ লক্ষ ইউরোপীয়কে দাস হিসাবে বন্দী করেছিল।

এমনকি আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজসমূহ এবং এগুলির নাবিকরাও বার্বারিদের ভয়াবহ আক্রমণ, নির্যাতন ও দাসত্বের শিকার হত। আমেরিকার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যখনই সম্ভব হত ব্রিটেন বিপুল পরিমাণে মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী আমেরিকান জাহাজসমূহের নাবিকদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের

পর আমেরিকা তার বাণিজ্য জাহাজসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বার্বারি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নিয়মিতভাবে মোটা পরিমাণে অর্থ প্রদানের শর্তে চুক্তি করেছিল। কায়রো বক্তৃতায় মুসলমানদেরকে খুশী করার জন্য প্রেসিডেন্ট ওবামা ইসলাম এবং আমেরিকার মধ্যে সমমানজনক অতীত সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই চুক্তিকে জাঁকালভাবে তুলে ধরেছিলেন, অথচ এটা ছিল আমেরিকার জন্য অবমাননাকর চুক্তি। এর পরেও আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজগুলির নিরাপত্তা রক্ষা হত না। আরও বেশী করে মুক্তিপণের জন্য মার্কিন বাণিজ্য জাহাজসমূহকে আক্রমণ করা হত। উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকানদের ভয়াবহ দাসত্ব বন্ধ করার জন্য আমেরিকাকে শেষ পর্যন্ত কঠিন যুদ্ধে জড়াতে হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স যে মরক্কোকে দখল করে তার একটি প্রধান কারণ ছিল ইউরোপীয়দেরকে যেভাবে দাস করা হত তার চির অবসান ঘটানো।

এটা স্মর্তব্য যে, দাস ব্যবস্থার জন্য ওবামা যে ইউরোপীয়দেরকে নিন্দার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন সেই ইউরোপীয়রাই আট শতাব্দীব্যাপী ছিল নৃশংসতম রূপের ইসলামী দাস ব্যবস্থার শিকার। এরপর তারা নিজেরাই আটলান্টিক পাড়ের ব্যাপকভাবে নিন্দিত দাস ব্যবসা শুরু করে। তা সত্ত্বেও আফ্রিকায় ইউরোপীয় দাস বাণিজ্যে মুসলমানরাই ছিল প্রধান দাস সরবরাহকারী। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের নিকট ৮০ শতাংশের উপর দাস যোগান দিত মুসলমানরা। ইউরোপীয়রা প্রধানত এই সমস্ত দাস ক্রয় করত এবং আমেরিকায় চালান দিত। আসলে বহু শতাব্দী ব্যাপী দাস শিকার, উৎপাদন, এবং ব্যবসা চালাবার ওস্তাদ বা শিক্ষাগুরু ছিল মুসলমানরা। আফ্রিকায় দাস ব্যবসাটি ছিল মূলত দীর্ঘ কাল ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী কারবার। এটাকেই চাঙ্গা করেছিল ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীরা।

আফ্রো-আমেরিকানদের অভিজ্ঞতার অনেকটাই যেখানে যাত্রা শুরু করেছিল সেটা যে ছিল ইউরোপীয় দাস ব্যবসা - এইটুকুই হচ্ছে ঘানায় দাসত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওবামা যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার সত্যতা। দাস ব্যবসার নিষ্ঠুর দিকটা বাদ দিলে এটার এক ধরনের ভাল পরিণতি আছে। সেটা হচ্ছে আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের যে

অবস্থা বর্তমানে রয়েছে তার তুলনায় নূতন পৃথিবীর (উত্তর আমেরিকা) কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক ভালো অবস্থায় আছে।

তবে আফ্রিকান দাসত্ব সম্পর্কে যা বলা হল সেটা একটা সত্যের মাত্র অর্ধেক। আফ্রিকান দাসত্বের আরেক ইতিহাস আছে - যার ব্যাপ্তি ছিল বিশালতর এবং স্থায়িত্ব ছিল দীর্ঘতর। সেটা হল খোজাকরণ। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আফ্রিকায় আরব মুসলিম আক্রমণ অভিযান দ্বারা। ইসলামী দাসত্বের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক আয়তনে পুরুষ দাসদের খোজাকরণের মাধ্যমে দাস বাজারে বিক্রি করা, যার ফল হচ্ছে বিরাট আয়াতনে মানব জাতির বংশধারার বিলুপ্তি। ইসলামী খোজাকরণের অমানবিকতা দ্বারা অগণিত আফ্রিকান পুরুষদের প্রকৃতি প্রদত্ত সবচেয়ে বড় পরিচিতি এবং দান তথা পুরুষত্বই যে কেড়ে নেওয়া হত শুধু তাই নয়, উপরন্তু এর দ্বারা যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হত তা ছিল ভয়াবহ। খোজাকরণ প্রক্রিয়ায় মৃত্যুর হার ছিল ৭৫ শতাংশ। ইউরোপীয়রা আফ্রিকান দাসদের আমেরিকায় পরিবহনের সময় এই দাসদের মৃত্যুহার ছিল ১০ শতাংশ, অথচ ইসলামী বিশ্বের গন্তব্যে কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের পৌঁছানো পর্যন্ত এদের মৃত্যুহার ছিল ৯০ শতাংশ পর্যন্ত।

ওবামা ইতিহাসের এক ভয়াবহ অধ্যায় হিসাবে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান দাস ব্যবসাকে সেভাবে নিন্দা জানিয়েছিলেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু একই অপরাধের আরও বেশী নিষ্ঠুর অংশীদার ইসলামকে তিনি যে ভাবে বাদ দিয়েছেন সেটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। এর দ্বারা সেই সব দুর্ভাগাদের আত্মার প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হয়েছে যারা ইসলামী নৃশংসতার শিকার এবং এদের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান ইউরোপীয়দের আত্মা, যাদেরকে তিনি সকল নিন্দার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করেছেন।

ইউরোপীয়দের দ্বারা কৃত দাস ব্যবস্থাকে সকলেই নিন্দা জানিয়েছেন। ইউরোপীয় হোন আর অন-ইউরোপীয় হোন, খ্রীষ্টান হোন অথবা মুসলমান হোন, পণ্ডিত হোন আর অপণ্ডিত হোন সকলেই তীব্রভাবে এর নিন্দা জানিয়েছেন। বাস্তবতা হচ্ছে এই

যে ইউরোপ একাই এই দাস ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্য শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল এবং সেখান থেকে কার্যকরভাবে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। অথচ দাসত্ব বিরোধী প্রচারকরা অনেককাল ধরেই আজকের ইউরোপীয়দেরকে অতীত দাসত্বের জন্য অনেক বেশী দায় স্বীকার করতে বলে, এবং তাদেরকে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিতে বলে যেমন - ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দাসত্বের ক্ষতিকর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই। অথচ দাসত্বে যার ভূমিকা অনেক বেশী বড়, অনেক বেশী নিষ্ঠুর এবং অনেক বেশী বেদনাদায়ক সেই ইসলাম সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় না; যেন ইসলাম এবং তার অনুসারীরা দাসত্বের কলঙ্ক থেকে মুক্ত।

বস্তুত আজ পর্যন্ত কতকগুলি ইসলামী দেশ (মৌরিতানিয়া, সৌদী আরব, এবং সুদান) দাস ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সুদান দাসত্বকে ব্যাপকতর করেছে। এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় অতীতের হোক আর বর্তমানের হোক মুসলমানদের দাস ব্যবস্থার প্রতি সমালোচনার অভাবকে। মৌরিতানিয়ায় প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ দাসত্বের অব্যাহত নিগড়ে আবদ্ধ রয়েছে, যাদের মুক্তির কোন আশা নাই। অন্য দিকে ১৯৮৫ সালে ইসলামবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সুদানে হাজার হাজার ও অযুত অযুত খ্রীষ্টান, প্রকৃতি উপাসক এবং এমনকি মুসলমানরা পর্যন্ত অপহৃত হয়ে দাসে পরিণত হচ্ছে (Khan, Islamic Jihad, p. 347-49)।

দাস প্রথার সমর্থনে কুরআনের যে আয়াতগুলির সংখ্যা বা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে আগ্রহী পাঠকদের জন্য সেই আয়াতগুলির বাংলা নিম্নে দেওয়া হল। এগুলির উৎস: আল কুরআনুল করীম, প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ছত্রিশতম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৭ -- বঙ্গরাষ্ট্র

কুরআন - ১৬ সূরা নাহ্ল: আয়াত ৭৬:
আল্লাহ আরও উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিয্ক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লারই প্রাপ্য; অথচ উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

কুরআন - ১৬ সূরা নাহ্ল: আয়াত ৭১:
আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদিগকে নিজেদের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

কুরআন - সূরা ২৩ মুমিনূন:
আয়াত ৫: যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে
আয়াত ৬: নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না।

কুরআন - সূরা ৩৩ আহযাব: আয়াত ৫৫:
নবী পত্নীদের জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে উহা (হিজাব বা পর্দা) পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

কুরআন - সূরা ৩০ রূম: আয়াত ২৮:
আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন: তোমাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেহ

কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরসপরকে কর? এইভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

কুরআন - সূরা ৭০ মা'আরিজ:
আয়াত ২৯: এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,
আয়াত-৩০: তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না

(নিবন্ধটি M. A. Khan-এরCondemning European Slavery Sparing Islam, the Bigger Culprit-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি “ইসলাম ওয়াচ” (www.islam-watch.org)-এ ২৩ জুলাই ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। এমএ খান ইসলাম ওয়াচের সম্পাদক এবং Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery -এর লেখক)।

যয়নব ও জানোয়ার: মুহাম্মদের সঙ্গে যয়নবের স্বর্গীয় বিবাহ এবং যায়িদের জীবন ধ্বংস

মুমিন সালিহ

অনৈতিক যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য কীভাবে আল্লাহ্ মুহাম্মদের পুত্রবধূ যয়নবের সঙ্গে তার বিবাহকে অনুমোদন দিয়েছিলেন; এই স্বর্গীয় বিধানের নাটকের মাধ্যমে কীভাবে এই বিবাহ ছিল যয়নবের প্রাক্তন স্বামী যায়িদের জন্য জীবন ধ্বংসকারী অভিজ্ঞতা; এবং কীভাবে মুহাম্মদ পৃথিবী থেকে যায়িদের দ্রুত প্রস্থানের ব্যবস্থা করেন।

যয়নব মুহাম্মদের অন্য স্ত্রীদেরকে বলেন, "তোমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন তোমাদের পিতারা, কিন্তু আমার জন্য বিবাহ ঠিক করেছিলেন সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্।" উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা যয়নব অন্যান্য নারীর তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তার বিবাহ ও পারিবারিক জীবন নিয়ে যে পরিকল্পনা করেছিলেন অন্য কোন নারী সেই ধরনের সুযোগ পায় নাই। যয়নবের বিবাহের বিষয়টি ফলক এবং কুরআনে সযত্নে লিপিবদ্ধ করা আছে। যয়নবের স্বর্গীয় বিবাহ ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র ছিল না। কারণ এটা এখন পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। মুহাম্মদের যৌন বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনে আল্লাহ্‌কে দত্তক গ্রহণের অত্যন্ত উন্নত প্রথাকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে নৈতিকভাবে এমন একটি নিকৃষ্ট বিধান চালু করতে হয়েছিল যাতে করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীর বক্ষদুগ্ধ পান করতে পারে। এই কাহিনীর আরেকটি ফল

হচ্ছে মুসলমানরা এখন পর্যন্ত "পর্দা (হিজাব) আয়াত" সম্পর্কে হতবুদ্ধি এবং বিভক্ত, যেটা কিনা নারীদেরকে ইসলামের অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ রেখেছে। কুরআন এবং নবীর বিখ্যাত জীবনীগুলিতে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ভালভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং যেগুলির যথার্থতা সম্পর্কে কোন মুসলমান প্রশ্ন করতে পারে না এই নিবন্ধে সেগুলি উল্লেখ করা হবে। অবশ্য বিশ্লেষণটা আমার এবং এটা বিখ্যাত ইসলামী প্রেম অথবা আরও ভালভাবে বললে ইসলামী লালসার কাহিনীকে বোঝার চেষ্টা।

যয়নব বিন্‌তু জাহ্‌শ তার মায়ের দিক থেকে মুহাম্মদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যয়নব মুহাম্মদের চাইতে তেইশ বৎসরের ছোট ছিলেন। মক্কা থাকাকালীন সময়ে মুহাম্মদ তাকে তার অল্প বয়স থেকেই অনেক বার দেখেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছিলেন। এ কারণেই মুহাম্মদ তাকে যায়িদের স্ত্রী হিসাবে পছন্দ করেছিলেন বলে মনে হয়।

যায়িদ ইব্‌ন হারিথা একজন আরব দাস ছিলেন, যাকে মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। খাদিজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ যায়িদকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন এবং যেহেতু তিনি তাকে খুব পছন্দ করতেন সেহেতু তিনি যায়িদকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

দত্তক প্রথাকে আরবরা খুব সমমানের সঙ্গে দেখত। আরবের প্রথানুযায়ী দত্তক সন্তানরা পিতা-মাতার আপন সন্তানদের ন্যায় অধিকার ভোগ করত। যায়িদ তার প্রভুর প্রতি দৃষ্টান্তমূলক বাধ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার সেবায় অসাধারণভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বিনিময়ে মুহাম্মদও যায়িদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং এই সদয়তার পরিমাণ এত বেশী ছিল যে পরিণতিতে মুহাম্মদ তাকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মদীনায় যায়িদ এবং যয়নবের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় মুহামমদ আরবের একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। প্রাচীন

কাল থেকে চলে আসা কিছু সংখ্যক বক্তব্য অনুযায়ী দাবী করা হয় যে, যয়নব এবং তার ভাই যায়িদের তুলনায় যয়নবের শ্রেণীগত অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যায়িদের সঙ্গে যয়নবের বিবাহে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এসব বক্তব্যে এও দাবী করা হয় যে, যয়নব প্রকৃতপক্ষে যায়িদের পরিবর্তে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহে আগ্রহী ছিলেন। মদীনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মদের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে যয়নবের যে ইচ্ছা থাকতে পারে সেটা বোধগম্য। কিন্তু শ্রেণীগত বিষয়টি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ দত্তক হবার সঙ্গে সঙ্গে যায়িদ আপনা আপনি তার পালক পিতার সামাজিক শ্রেণী মর্যাদা লাভ করেছিলেন। উপরন্তু যায়িদ আফ্রিকান দাস ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন আরব যুদ্ধবন্দী।

যায়িদ ও যয়নবের বিবাহ সম্পন্ন হবার পর স্বামী-স্ত্রী মদীনায় তাদের নিজ বাসগৃহে বাস করতেন। একদিন যখন যায়িদ বাড়ীর বাইরে ছিলেন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মুহাম্মদ তাদের বাসগৃহে আসেন। মুহাম্মদ যখন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন দরজার হাল্কা পর্দা বাতাসের দোলায় আন্দোলিত হয়ে ঘরের ভিতরে থাকা যয়নবের প্রায় নগ্ন দেহ দেখতে পান। মুহাম্মদ প্রায় উলঙ্গ সুন্দরী যয়নবের দেহসৌষ্ঠব দেখে হতচকিত হন এবং এই মন্তব্য করে চলে যান, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, হৃদয় যেভাবে চায় তিনি সেভাবে বদলে দিতে পারেন।" মুহাম্মদ যখন যয়নবকে যায়িদকে বিবাহ করতে বলেছিলেন সেই সময়ের মুহাম্মদের অনুভব থেকে এই "প্রার্থনা"-এর অর্থ ভিন্ন। অন্য কথায় তিনি তার প্রতি অতীতে আকৃষ্ট ছিলেন না, কিন্তু এখন আকৃষ্ট। যয়নবের কী পরিবর্তন হয়েছিল যা মুহাম্মদকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল? সপষ্টতই মুহামমদ যখন যয়নবের দিকে উঁকি মেরেছিলেন তখন তিনি তার ব্যক্তিত্বে কোন পরিবর্তন দেখেন নাই। যেটা দেখেছিলেন সেটা হচ্ছে যৌন আবেদনময় দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী এক প্রায় নগ্ন নারীকে। যাবার সময় মুহাম্মদ যা বলেছিলেন সেটা সহ যে ঘটনা ঘটেছিল যয়নব সেটা তার স্বামীকে বলেছিলেন।

বেশীর ভাগ সংসারে একই পরিবারের নারী এবং পুরুষ সদস্যরা কখনো কখনো একে অন্যকে বিব্রতকর অবস্থা বা পরিস্থিতিতে দেখে ফেলে। যারা এ ধরনের ঘটনা

দেখে তারা সেগুলিকে উপেক্ষা করে অথবা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবার চেষ্টা করে যাতে এগুলির কোন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব তাদের জীবনে না পড়ে। যয়নবের দরজায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মদ ছাড়া অন্য কোন লোক হলে দূর প্রসারী কোন ফলাফল ছাড়াই সেটি শেষ হয়ে যেত।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মেলামেশার পথ কঠোরভাবে বন্ধ করে রাখার ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমান বন্য জানোয়ারের মত আচরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ সৌদী আরবে একজন নারীর পা দেখে পুরুষরা যৌন উত্তেজনা বোধ করতে পারে। অস্ট্রেলীয় ইমাম তাজ আল-হিলালী সারা শরীর কাপড় দিয়ে না ঢাকা নারীদেরকে আবরণহীন মাংস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায় তারা হচ্ছে শিকারীর জন্য লোভনীয় খাদ্য। যাইহোক, এটা কল্পনা করা কষ্টকর যে পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন পুরুষ যার আছে বহুসংখ্যক স্ত্রী এবং যৌনদাসী, তিনি তার স্বল্প-বসনা পুত্রবধূকে দেখে যৌন দানবে পরিণত হতে পারেন।

নিজের পুত্রবধূকে দুর্ঘটনাবশত অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখা একজন পুরুষের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং এতে যেহেতু কারো দোষ নাই সেহেতু যায়িদেরও এতে আতঙ্কিত হবার কিছু ছিল না। কিন্তু যায়িদ এমন কিছু জানতেন যা অন্য কেউ জানত না। যায়িদ সারা জীবন মুহাম্মদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন এবং মক্কায় যখন তিনি গুরুত্বহীন ব্যক্তি ছিলেন তখন থেকে আরবের এক দুর্দান্ত যুদ্ধবাজ নেতায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত তাকে দেখে আসছিলেন, যিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিজের সংযোগের দাবী করতেন। যায়িদ মনোবিশ্লেষক ছিলেন না, তিনি এটাও জানতেন না যে, কেন আল্লাহ্ তার প্রভুকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। মুহাম্মদের সাফল্য যায়িদকে অবশ্যই অভিভূত করেছিল। মুহাম্মদের অস্বাভাবিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলোকে কীভাবে মেলাতে হবে তা যায়িদ জানতেন না। যায়িদ সম্ভবত মনে করতেন মুহাম্মদের সকল বৈশিষ্ট্যই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। দাস হিসাবে এবং পুত্র হিসাবে মুহাম্মদকে দীর্ঘদিন সেবা করার মধ্য দিয়ে মুহাম্মদের চরিত্র সম্পর্কে যায়িদের যথেষ্ট

ভাল ধারণা জন্মেছিল। তিনি জানতেন মুহাম্মদ কী পছন্দ করতেন এবং কীভাবে চিন্তা করতেন এবং মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে যৌন দানব নিহিত ছিল সে সম্পর্কেও তিনি জানতেন। যায়িদ এটা ভালভাবে জানতেন যে, মুহাম্মদ যখন একবার যয়নবের নগ্ন দেহসৌষ্ঠব দেখেছেন এবং ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন তখন পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নাই যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে তাকে বিরত করতে পারে। যায়িদের জন্য পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে, এই লড়াইয়ে তার পক্ষে যাওয়াই সম্ভব না।

যায়িদ মুহাম্মদের প্রকৃতি সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, আরবের সাধারণ মানুষের জন্য যেটা অচিন্তনীয় ছিল সে ধরনের কথা তিনি মুহাম্মদকে বলতে সাহস করেছিলেন। যায়িদ আতঙ্কিত হয়ে মুহাম্মদকে খুঁজে বের করেন। মুহাম্মদ তখনও যয়নবের কল্পনায় বিভোর। যায়িদ খোলাখুলি তার পালক-পিতাকে বললেন, "হয়ত আপনি যয়নবকে পছন্দ করেছেন। সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করছি।" এ কথা শুনে মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে রাখ।" অবশ্যই যায়িদ যয়নবকে মুহাম্মদ যে একজন ব্যক্তি হিসাবে পছন্দের পরিবর্তে যৌন সামগ্রী হিসাবে পছন্দ করেছিলেন সে কথা বুঝিয়েছিলেন।

কোন ঘটনা একটা মানুষকে আতঙ্কিত করতে এবং যেহেতু তার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখেছে সেহেতু তাকে তার নিকট সমর্পণের প্রস্তাব দিতে পারে? এ কথা ভেবে আমি বিস্ময়াভিভূত হই যে, কী পরিমাণ ভয় পেলে যায়িদের মত একজন তুচ্ছ মানুষ আল্লাহ্‌র নবী এবং মদীনার প্রধানের নিকট এই ধরনের অনৈতিক, আপত্তিকর ও অনুচিত প্রস্তাব দিবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন। যে কেউ এই আশা করবে যে, এই ধরনের অনৈতিকভাবে আপত্তিজনক প্রস্তাবে মুহাম্মদ ক্ষিপ্ত হবেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে উত্তর দিলেন যেন তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছিলঃ "তুমি তাকে রাখতে পার। (অবশ্য তুমি যদি চাপচাপি কর তবে আমি এটা নিব...)।"

যায়িদ এ কথা কেবলমাত্র অনুমান করেন নাই যে, সম্ভবত মুহাম্মদ যয়নবের দেহসৌষ্ঠব পছন্দ করেছিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলেন যে, মুহাম্মদ তার সুন্দর দেহসৌষ্ঠব দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। অন্যথায় যাহিদ মুহাম্মদের নিকট তার পুত্রবধূকে নিতে বলার সাহস পেতেন না। অনুরূপভাবে যয়নবের প্রতি মহাম্মদের লালসা কতখানি গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে যায়িদ সুনিশ্চিত ছিলেন, তা না হলে তার স্ত্রীর সঙ্গে মুহাম্মদের যৌন সঙ্গমের পথ করে দিবার জন্য তার স্ত্রীকে তালাক দিবার প্রস্তাব দিতে সাহস করতেন না।

যায়িদ সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন যে, মুহাম্মদ যে জিনিস চান সেটা পাবার পথে যে ব্যক্তি প্রবিন্ধক হবার সাহস করবে তাকে ধ্বংস করার মত সামর্থ্য মুহাম্মদের আছে। তা না হলে যাকে তার রক্ষা করার কথা তাকে কখনই তিনি হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন না।

যায়িদ নিশ্চিত ছিলেন যে, মুহাম্মদ তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবেনই। অন্যথায় তখন পর্যন্ত মুহামমদ আরবদের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসৃত দত্তক প্রথার যে আইনকে স্বীকৃতি দিতেন সেটাকে কলঙ্কিত করার প্রস্তাব দিবার সাহস যায়িদ করতেন না।

সেই মুহূর্ত থেকে যায়িদ জানতেন যে, যয়নবের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করার জন্য যা প্রয়োজন তা-ই মুহাম্মদ করবেন। এটার জন্য আরবের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন এবং ঐতিহ্য যদি ভাঙ্গতেও হয় তবে তাতেও মুহাম্মদ দ্বিধা করবেন না।

তিন দশকের অধিককাল যাবৎ মুহাম্মদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করার ফলে যায়িদ মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজস্ব মনোবিশ্লেষণ গড়েছিলেন। মুহাম্মদের উদারতা এবং দয়া সব সময়ই একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হত। যায়িদের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের যে দয়া এবং উদারতা ছিল তার কারণ ছিল মুহাম্মদের প্রতি যায়িদের অসাধারণ নিবেদন এবং সর্বাত্মক আনুগত্য। যায়িদ জানতেন যে তিনি মুহাম্মদের দত্তক পুত্র হলেও সেটার উপর খুব বেশী নির্ভর করা যাবে না, কারণ ঐ সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে যে যৌন দানব মুহাম্মদ ছিলেন তাকে সংযত করা

যাবে না।

যয়নবের প্রতি মুহাম্মদের যৌনাকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করে উদিত হয় নাই। মুহাম্মদ তখনও যয়নবকে নিয়ে তার কল্পনায় বিভোর ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলেন যে, যয়নবকে পাওয়া যায়িদের জন্য খুব বেশী হয়ে যায়। অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য মুহামমদ যেমন আল্লাহ্‌কে ব্যবহার করেছেন এ ক্ষেত্রেও তাকে সে কাজ করতে হল।

একদিন বিকালে মুহাম্মদ আয়েশার ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় কিছুক্ষণ তিনি চোখ বন্ধ করে রইলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি তখন যয়নবের দেহসৌষ্ঠবের কথা কল্পনা করছিলেন। অতঃপর একটি সমাধান উদ্ভাবন করে আকস্মিকভাবে চোখ খুললেন। চোখ খোলার পর মুখে হাসি এনে বললেন, "কে যয়নবের কাছে যাবে এবং তাকে সুসংবাদ দিবে? তাকে বিবাহ করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন।"

এটাই হচ্ছে তা যা আল্লাহকে বলতে হয়েছেঃ
(কুরআন- ৩৩: ৩৭) "স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।"

কুরআনের মূল আরবী ভাষ্যের অমার্জিত রূপকে ঢাকবার জন্য সাধারণত গুরুতর এবং ইচ্ছাকৃত ভুল অনুবাদ করা হয়। উপরোক্ত অনুবাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা

ঘটেছে। ইউসুফ আলী, পিকথাল এবং অন্য অনুবাদকরা আরবী শব্দ “ওয়াতারা” - এই শব্দের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন যার অর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া, প্রয়োজন। “বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো” এবং “বিবাহ বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা” সম্পর্কে যে সব কথা লেখা হয় সেগুলি পড়ে আমি না হেসে পারি না। মুহাম্মদের সময় কী ধরনের আনুষ্ঠানিকতা জানা ছিল?

আরও নির্ভুল অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল, “যখন যায়িদ তার কাছে যা চেয়েছিল তা পাওয়া শেষ করেছিল”। একটি মানুষের কাছে স্ত্রীর প্রয়োজন হয় সারা জীবনের জন্য। সফল বিবাহের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই যে, সে তার স্ত্রীকে বলতে পারে, “তোমার কাছে যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়েছে।” একমাত্র যৌন প্রয়োজন পূরণের পরে এ কথা বলা যেতে পারে। খুব সহজ ভাষায় উপরের আয়াতে বলা হচ্ছে, “যেহেতু যয়নবের কাছ থেকে যায়িদের যা পাওয়ার ছিল তা পেয়েছে সেহেতু এখন তোমার পালা।”

উপরের আয়াতে যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে সমগ্র ঘটনার যে সবচেয়ে বড় বলি সেই যায়িদের প্রতি হৃদয়হীনভাবে মুহাম্মদের অতীতের অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এই আয়াতে সাধারণভাবে নারী এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সপষ্টভাবে শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এই আয়াতে যে কথাটি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, যায়িদের সঙ্গে যয়নবের যে বিবাহ হয়েছিল তা ছিল কেবলমাত্র যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। এই আয়াতের মধ্য দিয়ে যয়নব সম্পর্কে মুহাম্মদের মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তার অসততা ধরা পড়েছে এবং তিনি যেভাবে যয়নবকে কেবলমাত্র একটি যৌন সামগ্রী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন যয়নব যে সেটা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন যায়িদের প্রেমময়ী স্ত্রী সেই বিষয়টি বুঝতেও মুহাম্মদের অক্ষমতা।

উপরোক্ত আয়াতে “তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত” - এই কথাটি আরেকটি যৌক্তিক এবং বিব্রতকর প্রশ্নের

উদ্রেক করে যার কোন যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র চেয়ে লোকজনকে বেশী ভয় করা মুসলমানদের জন্য পাপ। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে এই পাপ দ্বারা "ইস্‌মা" অর্থাৎ নবী হিসাবে তার চরিত্রে কোন ত্রুটি নাই এই ধারণা প্রশ্নের সমমুখীন হয়। যাইহোক, মুসলমানরা যারা কুরআনে শুধুমাত্র অলৌকিকতা দেখতে পায় তারা এই প্রশ্নকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে, "এই আয়াত এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যা প্রমাণ করে কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে; কারণ মুহাম্মদ যদি কুরআন রচনা করতেন তবে তিনি সেখানে এমন কিছু লেখতেন না যা তাকে তার সঙ্গে জড়িত করে।" কুরআন যে মুহাম্মদের নিজের চিন্তার সোচ্চার প্রকাশ এই ধারণা মুসলমানরা গ্রহণ করে না। মানুষের নিকটি এটা স্বাভাবিক যে, যখন তারা বোঝে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করে। জনমতের ভয়ে যয়নবকে নিজের জন্য পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করার জন্য মুহাম্মদ নিজে নিজেকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

যয়নবের বিষয়টি এমন একটি সপর্শকাতর ইসলামী বিষয় যা নিয়ে মুসলমানরা আলোচনা বা তর্ক করা তেমন একটা পছন্দ করে না। তারা নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থনে এই যুক্তি উপস্থিত করে যে, এই ঘটনার তাৎপর্য হচ্ছে দত্তক পুত্রদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে আরবে যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল সেটার অবসান ঘটানো। এ প্রসঙ্গে আরবের একটি পুরানো প্রবাদ মনে পড়ছে আর তা হচ্ছে "অপরাধের চেয়ে অজুহাত বেশী খারাপ।" মুসলমানরা নির্বাক হয়ে যায় যখন তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সমাজের জন্য ক্ষতিকর এ রকম একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা না ঘটিয়ে আল্লাহ্‌ নূতন বিধান প্রবর্তন করে ওহী নাজিল করতে পারতেন; অবশ্য আমরা যদি ধরে নিই যে পুরাতন বিধানটা খারাপ ছিল, যদিও বাস্তবে সেটা তা ছিল না।

মুহাম্মদ যতগুলি বিবাহ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে একমাত্র এইটিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপন করেছিলেন অথবা এইটিই ছিল একমাত্র বিবাহ যে বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি ভোজের আয়োজন করেন। এক বৃহৎ সংখ্যক অতিথি এই

বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় এবং বিবাহের ভোজন পর্বটি চলে কয়েক দিন ধরে। মুহামমদ তার এই উদারতার জন্য পরে হয়ত দুঃখ করেছিলেন, কারণ একদিন দেখলেন সকল অতিথি খেয়ে চলে গেলেও তিনজন অতিথি থেকে গিয়েছিল। মুহামমদ তার স্ত্রীদেরকে দেখতে অল্প সময়ের জন্য ঘরের ভিতর গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা তখনও গল্পে মত্ত আছে। মুহাম্মদ তখন যয়নবকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন অতিথিরা তার মূল্যবান সময় নষ্ট করছিল। অতিথিরা কখন যাবে তার জন্য মুহাম্মদ যখন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন তখন মুহাম্মদ নিশ্চয় সেই দিনটির কথা স্মরণ করছিলেন যখন তিনি যয়নবকে অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি সেই মৃদুমন্দ বাতাসের দোলার কথা স্মরণ করলেন যার আঘাতে হালকা পর্দা সরে গিয়ে যয়নবের সুন্দর শরীর তার সামনে উন্মোচিত হয়েছিল, যার ফলে তিনি যয়নবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। হঠাৎ এ কথা ভেবে মুহাম্মদ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, তার পরিবর্তে এই অতিথিদের ক্ষেত্রেও তো তা ঘটতে পারে! তারাও তো তার স্ত্রীদেরকে ঐ রকম স্বল্পবসনা অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে! বাতাসের দোলায় উন্মুক্ত হবে না এমন ভারী পর্দা দ্বারা মুহাম্মদ যয়নব এবং তার অন্য স্ত্রীদেরকে ঢেকে রাখবার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুধু সেই লোকগুলিকে বিদায় দিবার জন্যই নয় উপরন্তু তার কোন অনুসারীই যাতে করে তার ঘরের ভিতরে থাকা স্ত্রীদের প্রতি উঁকি দিতে না পারে এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে যাতে কেউ বিবাহ করতে না পারে সেই জন্য তিনি ওহী চাইলেন। আল্লাহ্‌ও মুহাম্মদের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনি মুসলিম নারী জাতির জন্য দূর প্রসারী ফলাফল সম্পন্ন ওহী নাজিল করলেন:

(কুরআনঃ ৩৩:৫৩) - "হে মুমিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা

তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।”

উপরোক্ত আয়াতটি হিজাব আয়াত হিসাবে খ্যাত। আরবী হিজাব অর্থ পর্দা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই আয়াতের সঙ্গে চুল অথবা মাথার স্কার্ফের কোন সম্পর্ক নাই। যে সব মুসলমান প্রতিদিন কুরআন পড়ে তাদের কয়জন এটা লক্ষ্য করেছে? আমি যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের কাউকেই এটা লক্ষ্য করতে দেখি নাই।

যায়িদের পরিণতি

এই ঘটনায় নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং মানবিক সততা সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যায়িদ, কারণ তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং পারিবারিক জীবন হারিয়েছিলেন। মুহাম্মদ যয়নবকে যেভাবে শুধুমাত্র যৌন সামগ্রী হিসাবে দেখেছিলেন যায়িদ সেভাবে যয়নবকে দেখেন নাই। যয়নব ছিলেন যায়িদের একমাত্র স্ত্রী ও জীবন সঙ্গিনী। এবং যয়নবই ছিলেন যায়িদের পারিবারিক জীবনের সবকিছু। আল্লাহ্ যে তার পরিবারকে ভেঙ্গে ফেললেন, তার ভালবাসার স্ত্রীকে তার নিকট থেকে কেড়ে নিলেন এবং যে মুহাম্মদের ছিল বহুসংখ্যক স্ত্রী ও যৌন সঙ্গিনী সেই মুহাম্মদের নিকট যয়নবকে তুলে দিলেন এই চিন্তা যায়িদের অন্তর্জগতে নিশ্চয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং এটাকে সামলাবার জন্য তাকে নিশ্চয় নিজের ভিতরে নিজের সঙ্গে অনেকবার লড়াই করতে হয়েছিল। একজন মানুষের যতই ইচ্ছাশক্তি অথবা সহনশীলতা থাকুক না কেন এই ধরনের একটা ঘটনার ধাক্কা যে কোন মানুষকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্ যায়িদকে এইটুকু ভয়ানক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরবর্তী

আয়াত হাজির করে যায়িদের উপর আর একটি ধ্বংসাত্মক আঘাত হানলেন:

(কুরআন- ৩৩:৪) -"... তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই..."

যায়িদ তার স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন, কিন্তু এরপরেও তিন দশক ধরে মুহাম্মদকে পিতা হিসাবে দেখার মধ্য দিয়ে যায়িদের সঙ্গে মুহাম্মদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সেই সম্পর্কটিকেও চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করা হল। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা যায়িদ একজন পরিত্যক্ত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন, যিনি শুধুমাত্র তার স্ত্রী এবং পিতাকেই হারান নাই বরং আরও হারিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ ও সামাজিক মর্যাদা। সম্পূর্ণরূপে ভগ্নহৃদয় এবং আল্লাহ্ এবং তার বার্তাবাহক দ্বারা পরিত্যক্ত যায়িদকে এই মিথ্যাকে মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হল যে, তিনিও লাভবান কারণ পবিত্র কুরআনে তার নাম স্থান পেয়েছে। যায়িদের সামনে একটি মাত্র রাস্তা খোলা ছিল, আর তা হল এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে ব্যক্তিটি ছিল তার ছায়ার মধ্যে বেঁচে থাকা, তার গুণগান করা এবং তিনি নিজেকে যত ভালবাসতেন তার চেয়েও বেশী তাকে ভালবাসা, যেটাকে আল্লাহ্ সকল মুসলমানের নিকট থেকে দাবী করেছেন:
(কুরআন- ৩৩:৬) "নবী মুমিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশী মূল্যবান...।"

মুহাম্মদ যা কিছু চেয়েছিলেন সে সব পেলেও তার সুখভোগের অনুভূতির ভিতরেও একটি সূক্ষ্ম কাঁটা বিঁধে থেকেছিল। সেটা হচ্ছে যায়িদের বিষণ্ন দৃষ্টি। যয়নবের সঙ্গে বিবাহের পর থেকে যায়িদের অস্তিত্ব ছিল মুহাম্মদের জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে পীড়াদায়ক ও গ্লানিকর। এক সময় যে যায়িদ ছিলেন মুহাম্মদের প্রাণপ্রিয় দত্তক পুত্র তিনি এখন আল্লাহ্‌র নিখুঁত মানুষের পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত। যায়িদকে বিদায় নিতে হবে।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ যায়িদকে তার শেষ যাত্রায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি

তাকে বর্তমান জর্দানের অন্তর্ভুক্ত মুতায় প্রায় তিন হাজার লোকের একটি ছোট, অপ্রস্তুত এবং সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঠান। শুরু থেকেই এটা অবধারিত ছিল যে, অভিযানটি ব্যর্থ হবে; কারণ রোমান সেনাবাহিনী ছিল সংখ্যায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে শ্রেষ্ঠ। মুহাম্মদ যায়িদকে পতাকা বহনের দায়িত্ব দেন, যেটা তাকে প্রথমেই শত্রুর লক্ষ্যবস্তু করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর অসম্মানজনক পরাজয়ে অবাক হবার কোন কারণ ছিল না। একইভাবে যুদ্ধে নিহতদের প্রথম সারিতে যারা থাকবেন, যায়িদ যে তাদের একজন হবেন সেটাও অস্বাভাবিক ছিল না। এখন থেকে মুহাম্মদ সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করতে থাকলেন।

(নিবন্ধটি মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিত, গবেষক ও লেখক Mumin Salih-এর লেখা Zaynab and the Beast: Zaynab's Divine Marriage to Muhammad & Zaid's Life-shattering Loss-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)-এ ১৩ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতগুলির একটি (৩৩:৬) বাদে বাকীগুলির বাংলা অনুবাদ লেখকের ইংরাজী অনুবাদ থেকে না করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কৃত বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ "আল-কুরআনুল করীম" থেকে নেওয়া। লেখক মুমিন সালিহ্-এর ই-মেইল ঠিকানা: rawandi@googlemail.com)

ইসলামের পতন অনিবার্য, পশ্চিমেরও

মুমিন সালিহ

চৌদ্দশ' বছর আগে এর আবির্ভাবে পর বর্তমানেই ইসলাম তার সবচেয়ে গতিময় অন্যতম সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ গতিময় সময়ের শুরু হয়েছিলো ৯/১১-এর সহিংস সংগ্রামের বহু আগে থেকেই; এ সংগ্রাম মুখ্যত পশ্চিমের বিরুদ্ধে হলেও তা এর বিপরীতে গিয়ে নিজেদের মতো করে দাঁড়াতে উদ্যোগী যে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীরই বিপক্ষে ছিলো। অধিকাংশ মুসলিমই এ পুনর্জাগরণের কালটিকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেয় এবং এটিকে ইসলাম এবং অনৈসলামিকতা বা কুফর-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম বলে মনে করে; আর মুহাম্মদ তো বলেছেনই যে, কুফর-এর বিরুদ্ধে তাদেরকে জিততেই হবে। যদিও পশ্চিম এখন এ সংঘর্ষের লক্ষ্যবস্তু, তবে সারা পৃথিবীর জন্য তা কম গুরুত্বের বিষয় নয়।

এক রকম চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়েই ইসলাম গত চৌদ্দটি শতাব্দী ধরে টিকে আছে এবং বিস্তারও লাভ করছে। এর শুরুর দিকে কয়েকটি বছর, যখন মুহাম্মদের নবীত্বের দাবী মক্কার আরব এবং ইয়াসরিব-এর [মদীনা] ইহুদীদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলো, কেবল তখনই ইসলামকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেই তেরো বছরের সময়কালে মুহাম্মদ তাঁর দাবীকে প্রমাণ করবার মতো কোনো যুক্তিগত বিতর্কই জেতেন নি। এর ফলেই তিনি প্রকৃত অনুসারী ভিড়াতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। হাতেগোণা যে ক'জন তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলো, তারা মূলত তাঁর বন্ধুপ্রতীম ও দানগ্রাহী ছিলো। যেই মুহাম্মদ ইয়াসরিব-এ (যার নাম তিনি পাল্টে

মদীনা করেছিলেন) তাঁর ঘাঁটি গাঁড়তে সমর্থ হলেন, তাঁর আগমনের কয়েক বছর আগে থেকে বেড়ে ওঠা যুক্তিগত বিতর্কগুলোর আর কোনো মানেই থাকলো না এবং কার্যত তা মিইয়ে গেলো। সেই থেকে, ইসলামকে কেবল কিছু সামরিক চ্যালেঞ্জই মোকাবিলা করতে হয়েছে; এর প্রতিপক্ষরা মূলত ইসলামের আদর্শের আসল রূপ উন্মোচন করার চেয়ে সামরিক বিজয়ের ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী ছিলো।

মুসলিম মানসের প্রকৃতি থেকেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কাছ থেকে আসা কোনো সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনাই মুসলিমরা বিবেচনা করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলো না; সে সমালোচনা যতোই খাঁটি বা বৈধ হোক না কেন। যদি মুসলিমরা তেমন কোনো শ্রমসাধ্য এবং শুদ্ধ কোনো কাজের [লেখার] কথা উল্লেখও করতো, তাকে ইসলামের শত্রুদের কাজ বলে নাকচ করে দিতো। অন্যদিকে, মুসলিমদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে আসা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হতো, যদিও এসব মুসলিম সমালোচককে অবিশ্বাসী বলেই তকমা সাঁটা হবে।

ইসলাম এর অনুগত বা অনুসারীরা একটি মোটা দাগের অন্ধবিশ্বাসায়ন এবং কুশলী ও ব্যাপক মগজধোলাই প্রক্রিয়া নিয়োজনের মাধ্যমে নিজ আদর্শকে সুরক্ষিত করেছে। প্রক্রিয়াটি এতোটাই অক্ষমায়নের যে, মুসলিমদের কাছে ধর্মের বাইরে তাদের অস্তিত্ব চিন্তা করাটাও ধারণাতীত ব্যাপার।

ফেলে আসা চৌদ্দটি শতক ধরে একবারের জন্যেও ইসলামকে নাঙ্গা চ্যালেঞ্জ বা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি; কেননা, যারা এর অতিকথাগুলো সম্পর্কে জানতো, তারা এও জানতো যে, এসব অতিকথার সত্যপ্রকাশের ফল কী হতে পারে। যেসব মুসলিম তাদের ধর্ম সম্পর্কে নিজস্ব সমালোচনিক মূল্যায়ন দাঁড় করাতে পেরেছিলো, এর ফলাফল তারা নিজেদের কাছেই রেখে দিতো; কেননা, তারা জানতো যে, নইলে কর্তৃপক্ষের হাতে কিংবা নিজেরই পরিবারের সদস্য বা বন্ধুজনের হাতে তাদের মাথা খোয়াতে হবে; আর, এরা আল্লাহ্'র রাহে তা করতে

পারলে খুশীই হবে।

এমনকি, গত কয়েক শতক ধরে যখন সারা পৃথিবী আলোকায়নের এক নতুন যুগের দ্বারোন্মোচনে প্রবৃত্ত হলো, ইসলামী কর্তৃপক্ষ ইসলাম সম্পর্কে এর বাইরে থেকে আসা যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মুসলিম মানসকে সিল-গালা করে দিলো। মুসলিম মানসে অঙ্কিত সেই কট্টর সিল-গালা আমাদের এ সমকালেও বর্তমান। অপ্রত্যাশিত বিষয়াদি, সে মুদ্রিত হোক আর দূরদর্শনে সম্প্রচারিতই হোক, সবই ছেঁকে নেওয়া হয়েছে। টানা চৌদ্দশ' বছর ধরে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের ধর্মকে দেখবার সুযোগই মুসলিমদের ঘটে নি। ইসলাম টিকে গেছে এজন্য যে, সবসময়ই এ পেয়েছে উপযুক্ত অন্ধকার পরিবেশ এবং একমুখী শিক্ষণ যাতে অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহিষ্ণুতার কোনো বালাই-ই নেই।

আন্তর্জাল বা ইন্টার্নেটের সূচনায় সবকিছুই বদলে গেছে। আন্তর্জালের শক্তিকে ধন্যবাদ, প্রায় সবার কাছেই পৃথিবী এখন উন্মুক্ত; এবং, মুসলিমদেরও সুযোগ ঘটছে ইসলাম সম্পর্কে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্পর্শে আসার, যা অতীতে অসম্ভবই ছিলো। আন্তর্জালই ইসলামের বিপক্ষে প্রথম প্রকৃত চ্যালেঞ্জ, কেননা এটি ইসলামের সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই ছিন্ন করে ফেলেছে। আন্তর্জাল ইসলামের আনুগত্য এবং সর্বান্ত:করণে আত্মসমর্পণের দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে। ইসলাম সম্পর্কিত সবকিছুই এখন অনুপুঙ্খ সমালোচনার বিষয়, এখন লোকেরা যৌক্তিক প্রশ্ন তুলতে এবং তার বিপরীতে যৌক্তিক উত্তরেরও প্রত্যাশা করতে পারছে। প্রতিদিন আন্তর্জাল এর অতিকথার সত্যোন্মোচনে এর ধর্মান্ধকারের ওপর বেশী বেশী করে আলো ফেলছে। এতে করে নড়ে যাচ্ছে ইসলামের আদর্শিক ভিত্তি। মুসলিমরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসায় অপেক্ষাকৃত শ্লথ, তাদের পরিকল্পনাপ্রসূত-মনন বিবেচনা করলে তা বিধেয়ও বটে। তারা ব্যাটারি-চালিত মুরগিছানার মতো আচরণ করে; অন্ধকারে তারা এতোটাই আচ্ছন্ন যে, আলো দেখলেও তারা বেরিয়ে আসতে ভয় পায়। আমরা আন্তর্জাল যুগের সূচনাপর্বে আছি মাত্র। প্রক্রিয়াটি ধীরগতি মনে হতে পারে। কিন্তু, বল এরই মধ্যে গড়াতে শুরু করেছে এবং আরো অনেক মুসলিম

সত্যের আলোয় জেগে উঠবে, আর আলোর পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে ইসলামের অতিকথার সত্যোন্মোচনে আমাদের এই এক্স-মুসলিম বা সাবেক-মুসলিমদের দলে যোগ দেবে।

পশ্চিমেরও পতন আসছে

আন্তরিকভাবেই আমি চাই যে, সময় আমার এ হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করুক; কিন্তু পশ্চিমের পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী হিসাবে উত্থিত পশ্চিমা জাতিগুলোর জন্য তাদের সেই উদ্দীপনার গতি হারাতে এবং নেতৃত্বদানের আশা খোয়াতে এক প্রজন্মের বেশী সময়ও লাগে নি। এ নিবন্ধের এ অংশটি লেখা মূলত ব্রিটেনের কথা মনে রেখেই, কেননা দৃশ্যত এ-ই নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলো। তবে অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থাও একই রকম।

পশ্চিমের এ অবক্ষয় মূলত স্বয়ংসৃষ্ট সমস্যা যার জন্য ইসলাম বা বাইরের অন্য কোনো প্রভাবককে দোষারোপ করা চলে না। কিন্তু এ এক বহুলচর্বিত সমীক্ষা যে, পশ্চিম ধ্বংস হতে চলেছে, ইসলাম ছাড়া বা ইসলাম-সমেতই; যদিও ইসলামই এর সুবিধাটা গ্রহণ করছে এবং ধ্বংসের এ গতিকে ত্বরান্বিত করতে খাটছেও প্রচুর। ইসলামী শিকারীরা অসহায় শিকারের মতোই পশ্চিমের দিকে চেয়ে আছে এবং হত্যার উপযুক্ত ক্ষণের জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। কোনোরকম লড়াই ছাড়াই, তারা পশ্চিমের উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী; আর এ ব্যাপারে তাদের কোনো রাখ-ঢাকও নেই। ক'বছর আগে কর্নেল গাদ্দাফি তো বললেনই যে, আগে মুসলিমেরা শক্তির সাহায্যে ইউরোপকে করায়ত্ত করতে পারে নি, কিন্তু এখন শক্তিপ্রয়োগ ছাড়াই তা করবে। লিবীয় এ নেতার টিপ্পনী যদি আপনার বিশ্বাস না হয়ে থাকে, কেবল একটিবার ব্রিটেনের যে কোনো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান নিজের চোখেই দেখতে পাবেন যে, ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ চেহারা কী দাঁড়াতে যাচ্ছে।

ব্যক্তির সমষ্টি বলেই জাতিগুলোর আচরণও ব্যক্তিরই মতো। পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়

কিংবা প্রতিযোগিতায় নামবার মতো চাপের সময়ই ব্যক্তির কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। জাতিও যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য জাতীয় সংগ্রামের মতো চাপের সময়ই সবচেয়ে বেশী কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে। গত যুদ্ধেই পশ্চিমা জাতিগুলোর কর্মক্ষমতা সর্বোচ্চ প্রদর্শিত হয়েছে। লোকেরা সুযোগের সন্ধান করে নি; তারা দু:সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে, দু:সহ ক্লেশ সহ্য করেছে, যুদ্ধে লড়েছে এবং জীবন খুইয়েছে যাতে তাদের সন্তান এবং পৌত্রদের জন্য একটা ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। ঐ সন্তান এবং পৌত্রেরাই আজকের পশ্চিমাবাসী প্রজন্ম যারা তাদের ঠাকুরদা'দের কঠোর পরিশ্রমের ফল নিঙড়ে নিচ্ছে। আজকের পশ্চিমাবাসী প্রজন্ম সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ভোগ করছে যা তাদের অর্জিত নয় এবং তা রক্ষায় তারা উদ্যমী বলেও মনে হয় না।

ইসলামের কারণে পশ্চিমকে কিছু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেমন: ৯/১১-এর আক্রমণ এবং মাদ্রিদ ও লন্ডনে বোমা হামলা। আমরা সবাই-ই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে ঘৃণা করি, কিন্তু ব্যক্তির মতো জাতিরও টিকে থাকবার জন্যে ঐ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতারও প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি! যখন ধারালো কোনোকিছুর উপর বসে পড়ে, বেদনার অস্বস্তিকর অনুভূতিই একজন মানুষকে ঐ জায়গা ছাড়তে চালিত করে, নৈলে সে রক্তপাতে মারাও যেতে পারে। আবার বেদনার অস্বস্তিকর অনুভূতিই আক্রান্তজনকে ভোগান্তির-কারণ নির্মূলের জন্যে চিকিৎসার সন্ধানে পাঠায়। বেদনা এক ধরনের সতর্কায়ন ব্যবস্থা যা লোকদেরকে মনযোগ-আবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিষয়ে সতর্ক করে। যাইহোক, তবু কিছু লোক থাকেই যারা যথেষ্ট অসাবধান, কিংবা বলা যেতে পারে নির্বোধ; এরা নিজেদের অসুস্থতার কাছে আত্মসমর্পণ অব্দি বেদনানাশক ওষুধ গেলা ছাড়া আর কোনো পদক্ষেপই নেয় না।

গত কয়েকটি দশক ধরে পৃথিবীজুড়ে পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুগুলোতে বোমাহামলাই পশ্চিমকে সমস্যার শিকড় উৎপাটনে উদ্যোগী করতে যথেষ্ট, আর আমরা সবাই-ই জানি সমস্যার এ শিকড়ের নাম ইসলাম। পরিবর্তে, রাজনৈতিকভাবে শুদ্ধ গোষ্ঠীসমূহ

প্রদত্ত বিধান মোতাবেক পশ্চিম বেছে নিয়েছে রাজনৈতিকভাবে শুদ্ধ সত্যতাপ্রতিপাদনের ধরনে বেদনানাশক ওষুধ গেলাকে। আমি ভয় পাচ্ছি এ ভেবে যে, এ হয়তো ধ্বংসেরই একটি ফর্মুলা।

আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পশ্চিমা সমাজগুলোর ভয়াবহ এক সহজাত সমস্যা রয়ে গেছে যা তাদেরকে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং অতীতে তাদের যাবতীয় অর্জনের বিপরীতে চালিত করছে। বাইরে থেকে আসা সবকিছুই খাঁটি ও সত্যনিষ্ঠ এবং নিজেদের সবকিছুই মিথ্যা ও দূষিত জ্ঞান করে তারা সহজেই নিজেদের সাংস্কৃতিক আত্মসমর্পণ ঘোষণা করছে। সাম্রাজ্যবাদ-উত্তর দোষে তারা এতোই আবিষ্ট যে, নিজেদের দেশের গুণের বিষয়ে তারা অন্ধকারে আছে।

পশ্চিমের দুর্বলতা ইসলামপন্থীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং তাদের ধর্মান্ধতা দূর করবার এবং মুসলিম মানসকে আলোকিত করবার লক্ষ্যে আমাদের ক্যাম্পেইনকে বাধাগ্রস্ত করছে। ইসলামে পশ্চিমাদের ধর্মান্তর নিজধর্মে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিকরণে ইসলামপন্থীদের প্রোপাগান্ডা প্রক্রিয়াকে জোরদার করছে। হরহামেশাই দেখা যায় যে, যখন মুসলিমরা ইসলামের অতিকথাগুলোকে প্রমাণ করবার জন্যে উত্তর খুঁজে ফেরে, ইসলামের সাথে থাকবার পক্ষে তারা সবচেয়ে অদ্ভূত এক যুক্তি দাঁড় করায়, বলে যে: "কিন্তু ইসলাম সঠিক না হলে ঐ পশ্চিমারা নিশ্চয় ধর্মান্তরিত হতো না।"

যেসব চরমপন্থী ইসলামী সংগঠন নিজেদের দেশে নিষিদ্ধ তাদের জন্য পশ্চিমই পরিণত হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে। পশ্চিমা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে কুখ্যাত কিছু ইসলামী সংগঠনকে টিকে থাকতে, বিকাশ লাভ করতে এবং সারা পৃথিবীর নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্তকরণে সহায়তাও দিয়েছে। এংলিকান চার্চের প্রধান ব্রিটেনে শরীয়া আইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা আরেকটি ইঙ্গিত বহন করে যে, ব্রিটেনের সমস্যা একেবারেই স্বেচ্ছারোপিত সমস্যা। তাদের সমস্যার বিপরীতে ব্রিটিশ জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কম করে বললেও হতাশাব্যঞ্জক।

যারা সমস্যাকে অনুধাবন করতে পেরেছে, তারা সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দেশান্তরে যাচ্ছে; আর বাকিরা অন্ধ সেজে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি যে, যখন জাতির অনুভূতিই এতো অসাড়, তখন আসন্ন কোনো বিপদের প্রতিক্রিয়া বা কোনো হুমকির মোকাবিলা আদৌ সম্ভব কিনা!

(নিবন্ধটি মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম তত্ত্ববিদ লেখক Mumin Salih-এর লেখা Islam will lose, so will the West-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি ওয়েব সাইট ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)--এ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত। লেখক মুমিন সালিহর ই-মেইল ঠিকানা rawandi@googlemail.com, ভাষান্তর: তৎসম বাঙালি অরণ্য)

সম্পদ লুকানোর কৌশলঃ বোরকা ও নেকাবের অবাক করা উৎস

জন, জে ও'নীল

মুহাম্মদ তার পালক পুত্র যায়িদের স্ত্রী যয়নাবকে দখল করে নিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলমান শাসক শ্রেণীর মধ্যে অপরের সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ-দখল করার অভ্যাস চালু হয়ে যায়। ফলে মুসলমানরা শিকার সন্ধানী ইসলামী কর্তৃপক্ষের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তাদের নারীদের লুকিয়ে রাখার জন্য সর্বাঙ্গ আবরণকারী বোরকা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। এটাই লেখকের ধারণা।

এটা সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, নারীদের পোশাক বিশেষ করে বোরকা ও নেকাবের মত পোশাক সম্পর্কে (যথাক্রমে আফগানিস্তান ও আরব থেকে আগত) ইসলামী বিধান মহিলাদের শালীনতা রক্ষা এবং পুরুষ দর্শকদের লোলুপ দৃষ্টি এড়ানোর জন্য প্রণীত হয়েছিল।

নিশ্চিতভাবেই এ ধরনের পোশাক পুরুষের আকর্ষণ রোধের একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। তবে এটা সঠিকভাবে নজরে আনা হয়েছে যে, ইসলামী আইনের কোথাও মুখমণ্ডল ও শরীর পুরোপুরি আবৃত করার কথা বলা হয় নাই। ‘‘শালীনতা’’ সম্পর্কে গুটি কয়েক সতর্ক বাণী ছাড়া কুরআন অথবা অন্য কোন ইসলামী গ্রন্থে কীভাবে নারীরা পোশাক পরবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন পরামর্শ দেওয়া হয় নাই বললেই চলে।

এ কারণে সাম্প্রতিক কালে বলা হচ্ছে যে, ইসলামের সঙ্গে বোরকা এবং নেকাবের

কোন সম্পর্ক নাই। এগুলো নিছক স্থানীয় প্রথা, পরে এগুলোকে ধর্মীয় অনুশাসনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে এটা একটা মেকি যুক্তি। এ কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই যে, প্রাক-ইসলামী আফগানিস্তানে অথবা ইসলাম-পূর্ব আরবে বোরকা অথবা নেকাব জাতীয় কোন কিছু পরিধান করা হত। এবং তাই এ পোশাকগুলো কেবল ইসলামী প্রেক্ষাপটে এবং ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় অনুধাবনযোগ্য।

কিন্তু যদি এ ধরনের পোশাক ইসলামী আইন দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে থাকে তবে এগুলো আসলো কোথা থেকে?

ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদেরকে ইসলাম এবং ইসলাম কর্তৃক বিকশিত সংস্কৃতির উপর ব্যাপক দৃষ্টি দিতে হবে। এটা করলেই বোরকা/নেকাব সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য অনাচ্ছাদিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। এবং এই সত্য অনেককে ভীষণভাবে বিচলিত করার মত।

গোড়ায় আরব উপদ্বীপ হতে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিল যুদ্ধে বিজয়ী ধর্মীয় মতবাদ রূপে। শুরুর দিকে বিজিত লোকজনের বেশীরভাগ ছিল খ্রীষ্টান। পরাজিতদের মধ্যে অনেক ইহুদীও ছিল। উভয় ধর্মের অনুসারীদের এই শর্তে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি দেওয়া হয় যে, এর জন্য তাদেরকে মুসলিম বিজেতাদের জিজিয়া নামের বিশেষ কর দিতে হবে।

প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খ্রীষ্টান ও ইহুদী ছিল বিধায় খিলাফত সরকারের আদায়কৃত এই করের পরিমাণ ছিল বিশাল অংকের। এ পরিস্থিতিতে এটা অবধারিত ছিল যে, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মান্তরিত না করে প্রজা হিসাবে থাকতে দেওয়াই ছিল আর্থিকভাবে লাভজনক। এ ধরনের কর থেকে মুসলমানদের রেহাই দেওয়া হয়েছিল। জিজিয়া কর এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমান শাসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরিত করতে চান নাই, খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরিত করার অর্থ ছিল রাজস্ব হারানো। ব্যাট ইয়ে'অর মন্তব্য করেছেনঃ

“বালাধুরি লিখেছেন যে, আরব অভিযানকারীদের হাতে ইরাকের পতন ঘটলে সৈন্যরা সাওয়াদ অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ‘ভাগ করে নিতে’ চেয়েছিল। খলীফা ওমর বিন আল খাত্তাব তাদের লুণ্ঠিত সামগ্রী ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দিলেও আদেশ জারি করেন যে, জমি এবং উটগুলোকে স্থানীয় কৃষকদের কাছে ছেড়ে আসতে হবে যাতে মুসলমানদের জন্য এগুলো রক্ষিত থাকেঃ “যদি তোমরা এগুলো উপস্থিতদের মধ্যে ভাগ করে দাও তবে যারা পরে আসবে তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।” এবং নবীর জামাতা আলী সাওয়াদের অমুসলমান কৃষকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, “তাদেরকে রাজস্বের উৎস এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসাবে থাকতে দাও।” [ব্যাট ইয়ে'অর', দি দিম্মি (জিম্মি), ১৯৮৫, পৃ. ৬৮]।

গুণ্ডা, বদমাশ ও ডাকাত জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অদ্ভূত প্রবণতা ব্যাখা করতে গেলে মুসলমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গী মাথায় রাখতে হবে যে, মুসলমানরা মনে করে কাফেরদের শ্রম চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করে জীবন যাপনের অধিকার তাদের রয়েছে। আমার লেখা “হোলি ওয়ারিয়রঃ ইসলাম এন্ড্ দি ডিমাইজ অব ক্ল্যাসিক্যাল সিভিলাইজেশন” গ্রন্থে আমি সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীকো-রোমান সভ্যতার ধ্বংস সাধনে মুসলিম তস্করবৃত্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছি। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম বাকী বিশ্বের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করে সেটা ছিল পূর্ণাঙ্গ ও অন্তহীন যুদ্ধ। সকল মানুষ আল্লাহ নামের একমাত্র ঈশ্বরকে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে মুহাম্মদের এবং কুরআনের (অর্থাৎ কুরআন ৮:৩৯) বক্তব্যের কারণে কাফের শাসিত বিশ্বের সঙ্গে সত্যিকার অথবা স্থায়ী শান্তি অসম্ভব। সকল মুসলমানকে তাই কাফের বিশ্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় “জিহাদে” অংশ নিতে অনুমতি এমনকি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে সেনাবাহিনী গড়ে তুলে কাফের পরিচালিত দেশগুলোকে আক্রমণ করতে পারে না; কিন্তু সে ছোট আকারের আক্রমণ এবং গেরিলা অভিযান চালাতে পারে। ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখি, মুসলমানরা যেখানেই অমুসলমানদের সান্নিধ্যে এসেছে সেখানে সব সময় তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

অসংখ্য ডাকাতির ঘটনার মত এই "ছোট ছোট" যুদ্ধ সপ্তম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যকরভাবে থামিয়ে দিতে এবং ধ্রুপদী সভ্যতার বিনাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত লুণ্ঠনোপযোগী অদখলকৃত কাফের সম্প্রদায় অথবা জাতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। অন্যদিকে ইসলামের অধীন বিপুল সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান জিম্মির সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। জিজিয়া করের ভয়াবহ নিষ্পেষণ ও সেই সঙ্গে মুসলিম প্রভুদের হাতে নিত্য অবমাননা এবং যখন-তখন সহিংসতার কারণে তারা ধর্মান্তরিত হতে থাকায় এমনটি ঘটেছিল।

কর আদায় এবং লুণ্ঠন করার মত খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসতে থাকায় খলীফা এবং সুলতানগণ তাদের চহিদামত সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করবে সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এর উত্তর ছিল পরিষ্কারঃ ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা অতি সামান্য সংখ্যায় অবশিষ্ট থাকলেও মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। এরা প্রায় সবাই ছিল ইহুদী এবং খ্রীষ্টান থেকে ধর্মান্তরিত। তাদের কাছ থেকে প্রশাসনের রাজস্ব ঘাটতি আদায়ের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্যের শ্রমের বিনিময়ে জীবন ধারণে অভ্যস্ত ছিল বিধায় মুসলমান শাসক শ্রেণী -- খলীফা, আমীর ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা গরীব মুসলমানদের নিপীড়ন করতে থাকে। আমরা অবশ্যই ব্যাপকভাবে এটা খুঁজে পাই।

মুসলমানদের ইতিহাসের গোটা সময়কাল জুড়ে খলীফা এবং সুলতানগণ তাদের নাগরিকদের সম্পদ যখন প্রয়োজন হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করেছেন। এতে ধর্মের কোন বাছবিচার ছিল না। এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন বার্নার্ড লুইস। ২০০১ সালে প্রকাশিত "হোয়াট ওয়েন্ট রং?" গ্রন্থে লুইস প্রশ্ন তুলেছেনঃ যে সভ্যতা তার বিশ্বাস অনুসারে শুরুতে এমন সম্ভবনা জাগিয়ে তুলেছিল তা কেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত হয়ে গেল? ভুল ছিল কোথায়?

লুইস কোন উত্তর না দিয়ে তার বই শেষ করেছেন। তারপরও এক জায়গায় তিনি এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানে চাকা যুক্ত গাড়ী কার্যত অজানা ছিল। এটা একেবারে হতবাক করার মত ঘটনা; কারণ চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যে (ব্যাবিলনিয়ায়) এবং আগেকার যুগে তার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তিনি এর এক চমকপ্রদ উপসংহার টেনেছেনঃ "চাকা যুক্ত গাড়ী আকারে বড় এবং একজন চাষীর জন্য তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। যেখানে যে সময় কোন আইন অথবা প্রথা এমনকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরও শক্তির রাশ টেনে ধরার জন্য যথেষ্ট ছিল না সেখানে তখন দৃশ্যমান ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ছিল অলাভজনক বিনিয়োগ। লুণ্ঠনজীবী কর্তৃপক্ষ অথবা প্রতিবেশীর ব্যাপারে একই ধরনের ভীতির ছাপ দেখা যায় সে সময়কার সাধারণ বাড়ীঘরের নির্মাণ কাঠামোতেঃ উঁচু, জানালাহীন দেওয়াল, সংকীর্ণ গলিপথে প্রায় লুক্কায়িত প্রবেশ দ্বার; সম্পদের কোন দৃশ্যমান লক্ষণ এড়িয়ে চলার সযত্ন চেষ্টা।" (বার্নার্ড লুইস, হোয়াট ওয়েন্ট রং?, ২০০১, পৃ. ১৫৮)।

খিলাফতের নামে এই চৌর্যোন্মাদনার মধ্যে মনে হয় শুধু ইহুদী আর খ্রীষ্টান কেন, এমনকি মুসলমানরাও অবাধে সমৃদ্ধি লাভে সক্ষম ছিল না।

তবে খলীফা এবং সুলতানগণ তাদের প্রজাদের পার্থিব সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধ করেন নাই। তারা আরো বেশী কেড়ে নিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক ছিলেন। একেবারে শুরু থেকেই, প্রথম "বিশ্বাসীদের কমান্ডার" মুহাম্মদ তার বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে নারী দখল করে নিতে ইতঃস্তত করেন নাই। মুহাম্মদের কমপক্ষে দুইজন স্ত্রী ছিল দখল করা; একজন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর কাছ থেকে এবং একজন তার পালক পুত্রের কাছ থেকে। খলীফারা অবশ্যই মুহাম্মদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে দেরী করেন নাই। মুসলমানদের ইতিহাসের গোটা সময় জুড়ে খলীফা এবং সুলতানরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে নারী কেড়ে নিয়েছেন নিয়মিতভাবে। এমনকি এই নারীরা বিবাহিতা হলেও তাতে ঘটনার কোন হেরফের হত না। বিবাহ বিচ্ছেদের (তালাক) ইসলামী নিয়ম হচ্ছে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" এ কথা

বললেই সব চুকে গেল। আর কিছুর দরকার হয় না। এর অর্থ হচ্ছে একজন স্বামীকে অতি সহজেই এ বাক্য তিনবার উচ্চারণে বাধ্য করা যেত। অনিচ্ছুক স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্য নির্যাতন ও মৃত্যুর হুমকিই যথেষ্ট ছিল।

লুণ্ঠনকারী কর্তৃত্বের এহেন সংস্কৃতিতে অবাক হওয়ার কিছু নাই যে ইসলামী জাহানে পুরুষরা নিজ নিজ স্ত্রীকে বোরকায় আবৃত করে লুকিয়ে রাখতে শুরু করেছিল। এই নূতন স্টাইলকে অবশ্যই শালীনতা অনুশীলনের সৎ প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়ে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রকৃত কারণ ছিল মুসলিম বাড়ীঘরের বৈচিত্র্যহীন, জানালাবিহীন বর্হিভাগ নির্মাণের অনুরূপঃ আপনার সম্পদ লুকিয়ে রাখা।

(নিবন্ধটি John J. O'Neill-এর লেখা Hiding Your Assets: The Surprising Origin of the Burka & Niqab-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি ইসলাম ওয়াচ [Islam-Watch]-এ ২৫ মার্চ ২০১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। জন জে, ও'নীল "হোলি ওয়ারিয়র্সঃ ইসলাম এন্ড দি ডিমাইজ অফ ক্ল্যাসিক্যাল সিভিলাইজেশন" নামক গ্রন্থের প্রণেতা)

ক্রুসেডঃ ইসলামী আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া

জন, জে ও'নীল

আমাদের যুগের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী কল্পকথা হচ্ছে, ক্রুসেড ছিল শান্ত এবং সংস্কৃতিবান ইসলামী জাহানের বিরুদ্ধে বিনা উস্কানিতে বর্বর ইউরোপের হামলা।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী ছিল ইসলামী সম্প্রসারণের মহান যুগ। আমাদের বলা হয় যে, একাদশ শতাব্দী নাগাদ - প্রথম ক্রুসেডের কাল - ইসলামী জাহান ছিল শান্ত ও স্থিতিশীল, এবং এর মোদ্দা কথা হচ্ছে ক্রুসেডাররা ছিল আক্রমণকারী। অবশ্যই ক্রুসেডারদেরকে পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপ থেকে আগত বর্বর যাযাবর হিসাবে ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত করা হয়। যারা একাদশ শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্যের সংস্কৃতিবান ও নগরকেন্দ্রিক বিশ্বে হামলা চালিয়েছিল।

এই জনপ্রিয় ভাষা প্রায়ই টেলিভিশনে এবং সংবাদ-পত্রের নিবন্ধে প্রয়োগ করা হয়। আমি অবশ্য আমার 'হোলি ওয়ারিঅর্‌সঃ ইসলাম এন্ড দ্য ডিমাইজ অফ ক্ল্যাসিক্যাল সিভিলাইজেশন'-এ দেখিয়েছি যে, ইসলামের আবির্ভাবের আগে 'পবিত্র যুদ্ধ' সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের কোন ধারণাই ছিল না। মুসলমানদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়রা এ ধারণা গ্রহণ করেছে। আমি আরো দেখিয়েছি যে, ক্রুসেডগুলো খ্রীষ্টান ইউরোপের পক্ষ থেকে মোটেই বিনা উস্কানিতে আগ্রাসন ছিল না; বরং ছিল একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোটা ইউরোপ দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলিম অগ্রাভিযান মোকাবেলায় পশ্চাদ্‌বাহিনীর তৎপরতার অংশ। ইউরোপ এমন হুমকি এর আগে

কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই।

হোলি ওয়ারিঅর্স পুস্তকে প্রদত্ত তথ্য সত্ত্বেও, মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ মর্মে একমত ছিলেন যে, ক্রুসেড পরিচালনার জন্য ইসলামের দিক থেকে হুমকি ছিল না বললেই চলে; আসলে মুসলমানরা ছিল অভ্যাসগত সহিংসতা ও লুণ্ঠনের সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন আদিম ও বর্বর ইউরোপের সুবিধাজনক টার্গেট। বলা হয়, ইউরোপীয় যোদ্ধা শ্রেণীর 'শক্তি' অভ্যন্তরীণ ধ্বংস সাধনের পরিবর্তে পোপের নির্দেশে ইসলামী জাহানের সহজ টার্গেটের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মারক্যুস বুল 'অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব দি ক্রুসেড্স্' গ্রন্থে ক্রুসেডের মূল পরীক্ষা করতে গিয়ে এই ধারায় চিন্তা করেছেন। প্রায় ১০ হাজার শব্দের এক নিবন্ধে বুল মুসলিম হুমকির বিষয় একেবারেই বিবেচনায় নিতে পারেন নাই।

তিনি বরং তা শুধু নাকচ করার উদেশ্যে এর উল্লেখ করেছেনঃ

''ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে লড়াইয়ের (ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে) প্রেক্ষাপট যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে দৃশ্যমান ছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল পোপের শাসন পরিষদ। এর ছিল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, ভূগোল সম্পর্কে ধারণা, এবং খ্রীষ্টান দুনিয়া ও এর উপর বাস্তব বা কাল্পনিক হুমকি সম্পর্কে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। এ বিষয়টির উপর জোর দেওয়া উচিত; কারণ, ক্রুসেডের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে প্রায়ই ভুলভাবে ১০৯৫ সালের আগের দশকগুলোর সেসব ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলা হয় যখন খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ পরস্পরের আক্রমণের মধ্যে ছিল। একটা ধারণা সদাসর্বদা প্রয়োগ করা হয় যে, প্রথম ক্রুসেড ছিল একাদশ শতাব্দীতে ধর্মযুদ্ধের চরিত্র লাভ করা একের পর এক যুদ্ধের পরিণতি; এই যুদ্ধগুলিকে ''পরীক্ষামূলকভাবে'' কার্যকর বলা যায় যা ইউরোপীয়দের কাছে ক্রুসেডের অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হাজির করেছিল। এটা অগ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী।' (মারক্যুস বুল, 'অরিজিনস', জনাথন রাইলি-স্মিথ সম্পাদিত দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব দি ক্রুসেড্স, পৃঃ১৯)

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কোন যুক্তিতে বুল স্পেন, সিসিলি এবং আনাতোলিয়ায় একাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত আগেকার খ্রীষ্টান-মুসলিম সংঘাতগুলোকে প্রথম ক্রুসেড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন? এর উত্তর কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবার নয়। তিনি বলেছেন, '১০৯৫-৬ সালে পোপ দ্বিতীয় উরবানের ক্রুসেডের আহ্বানকে যে জনগণ সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার উপর আঘাত হিসাবে দেখেছিল তা ভাবার জন্য বহু তথ্য-প্রমাণ আছে। এটা কার্যকর হবে বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলি থেকে এটি ছিল ভিন্ন।' (প্রাগুক্ত)।

অবশ্যই এটা ভিন্ন ছিলঃ পোপ কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে মার্চ করার জন্য এক বিশাল বাহিনী গঠন করতে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও যাজকদের এক মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন। অভিলাষ ও ব্যাপকতার বিচারে এটা ছিল নূতন। কিন্তু এ জন্য স্পেনে এবং সিসিলিতে এবং আনাতোলিয়ায় আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সঙ্গে এর যোগসূত্র খারিজ করে দেওয়া হাস্যকর। এ ধরনের বক্তব্য শুধু এমন এক পূর্বধারণা থেকে আসতে পারে যা কোন না কোন ভাবে ক্রুসেডারদেরকে আক্রমণকারী হিসাবে দেখতে চায় এবং সে কারণে খ্রীষ্টানরা ১০৯৫ পূর্ববর্তী দশকগুলোতে স্পেনে এবং গোটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে যে ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল তা থেকে ক্রুসেডরাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

আসল তথ্য হচ্ছে, প্রথম ক্রুসেডের পূর্ববর্তী ২০ বছরের মধ্যে গোটা আনাতোলিয়া খ্রীষ্টান বিশ্বের হস্তচ্যুত হয়। এই অঞ্চল ইউরোপের দ্বার- প্রান্তে অবস্থিত এবং আয়তনে ফ্রান্সের চেয়ে বড়। ১০৫০ সালে সেলজুক নেতা তোগরুল বেগ আনাতোলিয়ার খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন যারা এতদিন পর্যন্ত খলীফাদের ক্ষমতা প্রতিহত করেছিল। আমাদেরকে বলা হয় যে, সেই যুদ্ধে ১লাখ ৩০ হাজার খ্রীষ্টান মারা গিয়েছিল। কিন্তু ১০৬৩ সালে তোগরুল বেগের মৃত্যুর পর খ্রীষ্টানরা তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। অবশ্য এ স্বাধীনতা ছিল স্বল্পস্থায়ী। তোগরুল বেগের ভাইপো আল্প্ আর্স্লান নিজেকে সুলতান ঘোষণা করলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ১০৬৪ সালে আর্মেনিয়ার প্রাচীন রাজধানী আনি ধ্বংস হয়ে যায়।

আর্মেনিয়ার শেষ স্বাধীন শাসক কার্‌স্‌-এর যুবরাজ “তাওরাস পার্বত্য এলাকায় কিছু জমির পরিবর্তে আনন্দের সঙ্গে সম্রাটকে (বাইজেন্টাইন) তার রাজ্য হস্তান্তর করেন। (স্টিভেন রনচিম্যান, দি হিস্ট্রি অফ দি ক্রুসেড্‌স্‌; ১ম খণ্ড, কেমব্রিজ, ১৯৫১, পৃঃ ৬১)। এই সময়ে গোটা আর্মেনীয় জাতি শত শত মাইল দক্ষিণ ও পশ্চিমে গিয়ে কার্যকরভাবে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু তুর্কী হামলা চলতে থাকে। ১০৬৫ সাল থেকে এডেসার বিশাল সীমান্ত দুর্গ অবরোধ হয়ে দাঁড়ায় সাংবৎসরিক ঘটনা। ১০৬৬ সালে তারা আমানুস পবর্তমালার গিরিপথ দখল করে নেয়। পরবর্তী বসন্তকালে তারা সিসেরিয়ার কেপাডোসিয়ান নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তী শীতকালে মেলিটেইন এবং সেবাস্তিয়ায় বাইজেন্টাইন বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এসব বিজয়ের ফলে আল্‌প্‌ আর্‌স্‌লান গোটা আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এর এক বছর পর তিনি সাম্রাজের আরো গভীরে আক্রমণ চালান। ১০৬৮ সালে নিওসিসারিয়া ও অ্যামোরিয়াম, ১০৬৯ সালে আইকোনিয়াম এবং ১০৭০ সালে ঈজিয়ান উপকূলবর্তী কোনি আক্রান্ত হয়। (প্রাগুক্ত)।

এসব ঘটনায় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তুর্কীরা তখন সাম্রাজ্যের গোটা এশীয় অংশের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল। কন্‌সটান্টিনোপলের অবস্থান দিনদিন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। রাজকীয় সরকার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেনাবাহিনীর প্রতি সম্রাট দশম কন্‌সটেন্টাইনের অবহেলা এই বিপর্যয়ের জন্য বহুলাংশে দায়ী। এ বিপর্যয় গোটা সাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। রাজমাতা ইউডোসিয়ার তত্ত্বাবধানে বালক পুত্র ৭ম মিখাইলকে রেখে তিনি ১০৬৭ সালে মারা যান। পরের বছর ইউডোসিয়া প্রধান সেনাপতি রোমানাস ডাইওজিনেসকে বিয়ে করলে ডাইওজিনেস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রোমানাস একজন বীর সৈনিক এবং আন্তরিকভাবে দেশ প্রেমিক ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং চূড়ান্তভাবে আর্মেনিয়া পুনরুদ্ধারের উপর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। (প্রাগুক্ত)। সিংহাসনে বসার চার মাসের মধ্যে রোমানাস এক বিশাল কিন্তু অনির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনী গড়ে তুলে শত্রুকে মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন। গিবন লিখেছেন, ‘তিনটি প্রাণপণ যুদ্ধে তুর্কীদের ইউফ্রেটিসের অপর তীরে হটিয়ে দেওয়া

হয়। চতুর্থ এবং শেষ যুদ্ধে রোমানাস আর্মেনিয়া পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।" (ডিক্লাইন এন্ড ফল, অধ্যায়ঃ ৫৭)। এখানে অবশ্য মানযিকার্টের যুদ্ধে (১০৭১) তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। এভাবে সমগ্র আনাতোলিয়া চিরকালের জন্য হস্তচ্যুত হয়।

এই ঘটনাবলী সততার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে কোন রকম সন্দেহ থাকে না যে, আক্রমণকারী ছিল আল্‌প্‌ আর্‌সলান এবং তার তুর্কী বাহিনী। রোমানাস ডাইওজিনেসের আর্মেনিয়া অভিযান ছিল গোটা আনাতোলিয়া হারানো প্রতিহত করতে বাইজেনটাইনদের সর্বশেষ পাল্টা আক্রমণ। যদিও সদ্য প্রকাশিত চেম্বার্স ডিকশনারী অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে যুদ্ধটির বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছেঃ বাইযেনটাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানাস ডাইওজিনেস (১০৬৮- ৭১) তার সাম্রাজ্য আর্মেনিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভান হ্রদের কাছে মানযিকার্টের যুদ্ধে আল্‌প্‌ আর্‌স্‌লানের অধীন (১০৬৩- ৭২) সেলজুক তুর্কীদের হাতে পরাজিত হন, যিনি তখন আনাতোলিয়ায় পূর্ণাঙ্গ অভিযান চালান।" (ব্রুস লেনম্যান সম্পাদিত চেম্বার্‌স ডিকশনারি অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, লন্ডন, ২০০০, পৃঃ ৫৮৫)।

উপরে আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে ভুল তথ্য সমাবেশের এক নিপুণ দৃষ্টান্ত দেখলাম। সেখানে আক্রান্তকে আক্রমণকারী এবং আক্রমণকারীকে আক্রান্ত হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

এক বছর পর আল্‌প্‌ আর্‌স্‌লান নিহত হন। তার ছেলে মালেক শাহ (১০৭৪- ১০৮৪) এশিয়া মাইনর এবং কার্যত বাইযেনটাইনের অবশিষ্ট এশীয় ভূখণ্ডের সবটুকু দখলের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ সমস্ত বিজয়ের ফলে মার্মারা সাগরের দক্ষিণ তীরের নিসিয়া দুর্গ তুর্কীদের দখলে চলে যায় এবং কন্‌সটান্টিনোপলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

তখনকার এ সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা প্রথম ক্রুসেডের সূচনা ঘটায়। ৩৫ বছর সময়ের মধ্যে তুর্কীরা খ্রীষ্টান এলাকার এক বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে

ফেলেছিল, যার আয়তন ছিল ফ্রান্সের চেয়ে বড়। তুর্কীরা তখন ইউরোপের একেবারে দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা এটা ভাবতে অভ্যস্ত যে, ক্রুসেড ছিল প্রথমত এবং প্রধানত পবিত্রভূমি ও জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টানদের প্রচেষ্টা; কিন্তু এটা ভুল। তখন সম্রাট আলেক্সিয়াস কম্‌নেনাস পোপের কাছে তার বিখ্যাত আবেদন জানিয়েছিলেন। এ আবেদন জেরুজালেম মুক্ত করার জন্য ছিল না, বরং ছিল তার সাম্রাজ্যের দরজা থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করার জন্য, সাম্প্রতিক সময়ে অর্ধচন্দ্রের অনুসারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত ও দখলকৃত এশিয়া মাইনরের বিশাল খ্রীষ্টান এলাকা মুক্ত করার জন্য। এ কথা সত্য যে, তুর্কীরা তখন সিরিয়া/প্যালেস্টাইনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানে এক বর্বর রাজত্ব কায়েম করেছিল। এতে খ্রীষ্টান তীর্থ যাত্রী ও সে অঞ্চলের স্থানীয় খ্রীষ্টানরা অবর্ণনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছিল। পিটার দি হারমিট এবং অন্যরা এর যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা সাধারণ ইউরোপীয়দের মধ্যে ক্রুসেডীয় আন্দোলনের পক্ষে জোরালো আবেগময় উপাদান যুগিয়েছিল। তবে অন্তত গোড়ার দিকে তীর্থযাত্রীদের স্বস্তি দেওয়া ক্রুসেডারদের মূল লক্ষ্য ছিল না। যাইহোক, প্যালেস্টাইনে তুর্কী শাসনের বর্বর ধরন ছিল তাদের দখলকৃত গোটা খ্রীষ্টান অঞ্চলে তাদের আচরণের অনুরূপ।

গিবন গোটা নিকট প্রাচ্যে তাদের শাসনের চরিত্র বিস্তারিত তুলে ধরেছেন এভাবেঃ

‘প্রাচ্যদেশীয় খ্রীষ্টানগণ এবং লাতিন তীর্থ যাত্রীরা বিলাপ করার দশায় পতিত হয়। আগে নিয়মিত সরকারের আমলে খলীফাদের সঙ্গে যে সমঝোতা ছিল তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে উত্তরের বহিরাগতরা তাদের উপর নির্মম অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দেয়। মহান সুলতান তার দরবারে এবং শিবিরে পারস্যের শিল্পকর্ম ও ভব্যতা কিছুটা হলেও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী জাতির, বিশেষ করে পশুচারী উপজাতিগুলোর শরীর থেকে তখনও মরুভূমির অগ্নিময় নিঃশ্বাস বের হচ্ছিল। নিসিয়া থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের দেশগুলো বিজাতীয় ও স্থানীয় শত্রুতার শিকার হয়। অনিশ্চিত সীমান্ত বিপজ্জনকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী প্যালেস্টাইনের মেষ-পালকগণ বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে ধীরগতিতে মুনাফা অর্জন করার মত

অতটা ধৈর্যশীল ছিল না। তাদের তেমন অবসর বা ক্ষমতা ছিল না। অশেষ দুর্ভোগ পার হয়ে যে তীর্থ যাত্রীরা জেরুজালেমের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত, তারা পবিত্র সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি লাভের আগেই ব্যক্তিগত লুণ্ঠন অথবা সরকারী নির্যাতনের শিকার হত, প্রায়ই তারা অনাহারে এবং রোগ-ব্যাধিতে ভুগত। নিজস্ব বর্বরতার এক ধরনের উন্মাদনা দ্বারা তুর্কীরা প্রত্যেক গোষ্ঠীর যাজকদের অপমান করতে উদ্বুদ্ধ হত। গোষ্ঠীর লোকজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তাদের যাজককে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে আটক রাখা হত; এবং চার্চ অব দি রিসারেকশনে ঐশ প্রার্থনা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হত দখলদার প্রভুদের গুণ্ডামীর কারণে।' (অধ্যায়ঃ ৫৭)

ইউরোপের সাধারণ কৃষকরা হয়ত প্রাচ্যের বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল না। কিন্তু শাসক শ্রেণীর এবং চার্চের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তারপরও ইউরোপের তৎকালীন কৃষক ও কারিগর শ্রেণী যদি আনাতোলিয়া সম্পর্কে সামান্য জেনে থাকে তবে মুসলিম হুমকি সম্পর্কে তাদের কিছুটা ধারণা থাকার কথা। মারকুস বুল তারা কিছুই জানত না বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর স্পেনে তৃতীয় আব্দুর রহমান এবং আল-মনসুরের অগ্রাভিযানের ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সে বন্যার মত খ্রীষ্টান শরণার্থীরা আসতে থাকে। একাদশ শতাব্দীতেও দক্ষিণ ফ্রান্সে অব্যাহত থাকা মুসলিম হামলার কারণে শরণার্থীরা মধ্য ও উত্তর ফ্রান্সে পালিয়ে আসে। এই লোকগুলো পশ্চিম ইউরোপের বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ইসলাম এবং মুসলমানরা আসলে কী বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে ইউরোপীয় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। তারা ভাল করে জানত যে মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের শত্রু। তারা এও জানত যে মুসলমানরা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শরু করেছে এবং নারী ও শিশুদের দাস বানাচ্ছে। মুসলমানরা সমগ্র স্পেন দখল করে নিয়েছে এবং ফ্রান্সের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়টির উপর বারবার জোর দেওয়া উচিত। বাস্তবতা হচ্ছে, শান্তি ও সহাবস্থান

থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে দশম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইসলাম আবরো আগ্রাসী হয়ে উঠে। মুসলিম বাহিনী রাজ্য দখলের জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলামী জাহানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করে। পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে ভারত আক্রান্ত হয়। এই নূতন আগ্রাসন শুধু পূর্বের ও পশ্চিমের সীমান্তে সীমিত ছিল না, ইসলামের গোটা সীমান্ত জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও বাইজেন্টিয়ামের খ্রীষ্টান রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়। সিসিলি এবং অন্যান্য ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় মুসলিম বাহিনী খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধায়। এই নূতন ইসলামী আগ্রাসনের অনেক দিক, বিশেষ করে একাদশ শতাব্দীর শুরুতে স্পেন ও ভারতে যা ঘটেছিল, আগেকার অষ্টম শতাব্দীর ইসলামী সম্প্রসারণের কথা মনে করিয়ে দেয়। এগুলো এমনই অনুরূপ ছিল যে, এমনকি ইসলাম সম্পর্কে অসতর্ক পর্যবেক্ষকরা এ ধর্মের আবির্ভাব কাল নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগতে পারেন। তারা মনে করতে পারেন যে, ইসলামের জন্ম তারিখ ভুল করে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের বলা হয় যে, ভারতে মূল ইসলামী আগ্রাসন শুরু হয় তুর্কী-ভাষী আফগান শাহজাদা গযনীর মাহ্‌মুদের বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে। তিনি উত্তর ভারতে ১৭ বার আক্রমণ চালান। এসব হামলা ১০০১ সালে শুরু হয় এবং তার মৃত্যুর মাত্র ৪ বছর বা এই রকম সময় আগে ১০২৬ সালে শেষ হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব হামলায় ভারতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। ১০২০ সাল নাগাদ সিন্ধু উপত্যকা, আফগানিস্তান ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা মাহমুদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সংঘটিত এসব হামলার মধ্যে তিন শতাব্দী আগে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিচালিত আগ্রাসনের প্রায় হুবহু প্রতিফলন দেখা যায়। কাসিম প্রায় একই অঞ্চল নিয়ে এক ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন (৭১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ)।

এটা অদ্ভূত যে, গযনীর মাহ্‌মুদ এবং তার পূর্বসূরীর নামের মধ্যে মিল রয়েছে। গযনীর 'ন' কাসিম থেকে এটাকে পৃথক করেছে। 'ন' না থেকে 'ম' থাকলে গযনীকে কাসমিও লেখা যেত। গজনী আর কাসমি খুব পৃথক নয়।

ইসলামী জাহানের পশ্চিম প্রান্তে আমরা একই লক্ষণ দেখতে পাই। রুনচিমান লিখেছেন, ‘দশম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানরা খ্রীষ্টান জগতের জন্য প্রকৃত হুমকি হয়ে উঠে।’ তৃতীয় আব্দুর রহমানের মধ্যে মুহাম্মদের অনুসারীরা এমন এক নেতা পেয়ে যায় যিনি অষ্টম শতাব্দীর সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। কর্ডোভা খিলাফতের প্রতিষ্টাতা হিসাবে তিনি জাঁকজমক ও সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার বাহিনী যুদ্ধ করে খ্রীষ্টানদের উত্তরে হাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি যেসব যুদ্ধ করেছিলেন সেগুলো দ্বারা দুই ধর্মবিশ্বাসীদের সীমান্ত চিহ্নিত হয়েছিল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় ডুউরো নদীর তীরে সালামানকা ও ভল্লাদলিদের মাঝখানে সিমানকাসে (৯৩৯ খ্রীঃ)। ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। এসব এলাকা দু’শতাব্দী আগে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিল। পরে অবশ্য খ্রীষ্টানরা সেগুলো পুনরুদ্ধার করে। অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় আবদুর রহমান ছিলেন তার পূর্বসূরীর অনুরূপ। এমনকি অষ্টম শতাব্দীর মুসলিম বিজেতা প্রথম আবদুর রহমানের সঙ্গে তার নামের মিল রয়েছে। এই নূতন আগ্রাসন আল-মনসুরের (৯৮০-১০০২ খ্রীঃ) অধীনে অব্যাহত থাকে। তার আমলে মুসলিম শক্তি উত্তরাঞ্চলসহ গোটা স্পেন দখল করে নেয়। তিনি লিওন, বার্সিলোনা ও সান্তিয়াগো ডি কম্পোসটেলা জ্বালিয়ে দেন এবং তার প্রায় তিন শতাব্দী আগেকার মুসলমান পূর্বসূরীদের মত পিরেনীসের উপর অভিযান পরিচালনা করেন। আমাদের বলা হয়, আল-মনসুরের আমলের মত ‘এতটা বিপর্যয়ে খ্রীষ্টানরা আগে কখনও পড়ে নাই।’ (লুইস বার্ট্রান্ড, দি হিস্ট্রি অফ স্পেন, ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৪৫, পৃঃ ৫৭)।

আল-মনসুরের আক্রমণই শেষ পযর্ন্ত খ্রীষ্টান ইউরোপের জাগরণ ঘটায়। তারা রিকনকুইসতা অভিযান শুরু করে। নাভারের তৃতীয় সানশো এবং নরমান ব্যারন রজার ডি টনি ১০২০ সাল থেকে এর নেতৃত্ব দেন। এসব ঘটনা ৭১৮ সাল নাগাদ কভাডোঙ্গায় ডন পেলাইয়োর বিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্বকালে সূচিত রিকনকুইসতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

পাঠকরা অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, একাদশ শতাব্দীতে ইসলামী আগ্রাসনের এই

‘পুনরুজ্জীবনের’ সঙ্গে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর ইসলামী অভিযানসমূহের এমন হুবহু মিল কেন? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাবে। এখন যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে দশম ও একাদশ শতাব্দী ছিল ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের কাল। খ্রীষ্টান বিশ্ব সংলগ্ন ইসলামী সীমান্তের সর্বত্র এই সম্প্রসারণ অনুভূত হচ্ছিল। এটা সুস্পষ্ট যে, ক্রুসেড ছিল এই আগ্রাসন থামানোর চেষ্টার এক অংশ।

(নিবন্ধটি John J. O’Neill-এর The Crusades: A Response to Islamic Aggression-এর বাংলা অনুবাদ। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি ইসলাম ওয়াচে [www.islam-watch.org] ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০-এ প্রকাশিত হয়। লেখক Holy Warriors: Islam and the Demise of Classical Civilization নামক গ্রন্থের প্রণেতা)

ইসলামে ধর্ষণ এবং তার চার সাক্ষী

অবিশ্বাসী ফকহুর

ইসলামে ধর্ষণ সংক্রান্ত উদ্ভট চিন্তা এবং আইন

আমার সঙ্গে এক নতুন বান্ধবীর পরিচয় হয়েছে। তিনি ইসলামী বিশ্বে নারীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে তার উদ্বেগের কথা বলছিলেন। যে বিষয়টির তিনি তীব্র প্রতিবাদ করছিলেন সেটা হচ্ছে - পুরুষ ধর্ষণকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে ধর্ষণের জন্য প্রায়ই ধর্ষিতা নারীকে দায়ী করা হয় এবং এমনকি শরিয়া আদালতে সাজা দেওয়া হয়।

ইসলাম ধর্ষণ সম্পর্কে যে সব অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে সেগুলোর শিকড় সন্ধানের আগে আমাদের উচিত ইসলামের নবীর সর্বকনিষ্ঠা কিশোরী স্ত্রী আয়েশার দুর্ভোগ সংক্রান্ত গুজবের বিষয়ে জানা।
(ব্যাপক বিশ্লেষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এতে ভিতরের কিছু তথ্য জানানো হয়েছে মাত্র। আমি নিশ্চিত, বিষয়টি নিয়ে কয়েক খণ্ডের বই লেখা যায়।)

আয়েশাকে নিয়ে কেলেঙ্কারির বিস্তারিত তথ্য ইসলামী গ্রন্থ হাদীস এবং সিরায় রয়েছে (যথা, সহিহ্ মুসলিম, পুস্তক ৩৭, সংখ্যা ৬৬৭৩, সহিহ্ বুখারী, তৃতীয় খণ্ড, পুস্তক ৪৮, সংখ্যা ৮২৯)।

বর্ণিত কাহিনীগুলো দীর্ঘ। সংক্ষেপে বলতে গেলে - আয়েশা একদল মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। একদিন ভুলক্রমে সেনাবাহিনী তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। একজন মুসলমান সেনাদলটির চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। সে আয়েশাকে খুঁজে পায়। আয়েশা তার সঙ্গে মূল বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন।

কতিপয় মুসলমান তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি সৈনিকটির সঙ্গে যৌন সঙ্গম করেছেন। আয়েশা দৃঢ়তার সঙ্গে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং অত্যন্ত মর্মাহত হন। কিন্তু গুজব চলতেই থাকে।

এক পর্যায়ে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়। তাতে ছড়িয়ে পড়া গুজব প্রসঙ্গে আয়েশাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়।

কুরআন: ২৪:১৩-১৬: কেন তারা এর জন্য চার জন সাক্ষী আনে নাই? কিন্তু তারা যেহেতু সাক্ষীগণকে আনে নাই সেহেতু তারা আল্লাহর সম্মুখে মিথ্যাবাদী। এবং এটা কি নয় যে, আল্লাহর মহিমা এবং ইহকাল ও পরকালে তার করুণা তোমাদের উপর না থাকলে, যে কথাবার্তা তোমরা বলছ তার জন্য নিশ্চিত ভাবেই কঠিন শাসন তোমাদের স্পর্শ করবে। যার সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নাই সেটা তোমরা জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করেছ এবং মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছ। এবং তোমরা এটাকে সহজ ব্যাপার মনে করেছ। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে বিষয়টি ছিল গুরুতর। এবং যখন তোমরা এটা শুনলে, কেন তোমরা বল নাই: এটা আমাদের উচিৎ নয় যে আমরা এটা নিয়ে কথা বলি; সমস্ত মর্যাদা আপনার। এটা একটা বিরাট মিথ্যা অপবাদ!

কুরআন: ২৪:৪ বলছে যে, যারা চারজন সাক্ষী আনতে পারবে না তাদের বেত্রাঘাত করা হবে; এবং যারা মুক্ত নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পর চারজন সাক্ষী হাজির করে না, তাদের বেত্রাঘাত কর, আশিবার দোররা (মার) এবং কখনো তাদের কাছ থেকে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ কর না, এবং তারা আইন ভঙ্গকারী।

এর ভিত্তিতে ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন যে, ব্যভিচার বা অনুরূপ যৌন দুষ্কর্ম প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শীকে হজির করতে হবে। একজন নারীর সাক্ষ্য হচ্ছে পুরুষের অর্ধেক, এবং তা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ (কুরআন ২:২৮২)।

আমি এ ব্যাপারে যা বুঝি (এবং আমি এটা বুঝে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম), চারজন চাক্ষুস সাক্ষীর নিয়ম চালু করা হয়েছিল মুসলমান নারীদেরকে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমের (জেনা) মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য। কতিপয় ইসলামী আলেম এই নিয়মকে জটিল পরিস্থিতিতেও টেনে এনেছেন, যাতে বলা হয়েছে: একজন নারী যদি দাবী করে যে সে ধর্ষিতা হয়েছে তবে ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে এ মামলা প্রমাণের জন্য তাকে শরিয়া আদালতে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে হবে। যদি সে চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারে, তার মামলাটি সতীত্ব সংক্রান্ত অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং সে অনুযায়ী তার সাজা হবে। বিকল্প হিসাবে, মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করায় তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। ফিকাহ শাস্ত্রের একটি ধারায় গর্ভধারণকেও যৌন দুষ্কর্মের পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ধর্ষণের শিকার কোন নারী যদি গর্ভবতী হয় এবং সে যদি ধর্ষণ প্রমাণ করতে না পারে তবে তাকে দোররা মারা হবে অথবা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, পাকিস্তান দুই দশকের বেশী সময় ধরে হদুদ অধ্যাদেশ বলবৎ রেখেছে, এবং এতে ধর্ষিতার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত শর্তগুলো রয়েছে। মাত্র অতি সম্প্রতি একটি নারী সুরক্ষা বিল পার্লামেন্টে পাস হয়েছে যাতে ধর্ষণের শিকার নারীকে প্রচালিত আইনে ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সদস্যরা এ বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

ইরানে, নাজানীন মাহাবাদ ফাতেহী নিজেকে এবং তার ভাইজিকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করার অপরাধে মৃতদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে

তিনি ধর্ষণের চেষ্টাকারী এক জনকে ছুরির আঘাতে মেরে ফেলেন। চারজন পুরুষ সাক্ষী না থাকায় এ ঘটনায় তাকে মৃতদণ্ড দেওয়া হয়। (ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ ও মিডিয়ায় প্রচারের কারণে পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়)।

আমি এ বিষয়ে বিবিসিতে একটি চমৎকার নিবন্ধ পেয়েছি: নারী ও শরিয়া নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে।

বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মনে এমন একটি ধারণাও রয়েছে যে, যদি কোন নারী ধর্ষিতা হয় তবে সেটা সাধারণত তার দোষ; উদাহরণ স্বরূপ, বোরখা না পরে রাস্তায় তার উপস্থিতি বেচারা পুরুষটিকে প্ররোচিত করেছে তাকে ধর্ষণ করতে। পশ্চিমা মুসলমানদের মধ্যে এই কুখ্যাত মানসিকতার একটা উদাহরণ হচ্ছে বর্তমান যুগে বাসকারী ৭ম শতাব্দীর নারী বিদ্বেষী অস্ট্রেলীয় বর্বর তাজ উল দীন আল হিলালী। এক জুম্মার নামাজে সে ফতোয়া দিয়েছিল, যদি কোন নারী ধর্ষিতা হয় তবে সেটা তার দোষ, কারণ সে নিজের বাড়ীতে ছিল না।

সে আরো বলেছিল, "যদি তোমরা মাংস নিয়ে রাস্তায়, অথবা বাগানে, অথবা পার্কে, অথবা বাড়ীর পিছনে ঢাকনা বিহীনভাবে রেখে আস, এবং বিড়াল এসে সেটা খেয়ে যায় .... তবে কার দোষ, বিড়ালের নাকি ঢাকনা বিহীন মাংসের? ঢাকনা বিহীন মাংসই হচ্ছে সমস্যা।"

গোঁড়ারা আসে এবং যায়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে বিপত্তির কারণ হচ্ছে সে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃস্থানীয় মুসলমান ইমাম, এবং জুম্মার নামাজে দেওয়া খুতবা জানাজানি হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ হাজার মুসলমান এর সমর্থনে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। অন্য মুসলমান নেতারাও তাকে সমর্থন করেছিল।

আমার এটা পরিষ্কার করা আবশ্যক যে, মুসলমান নারীদেরকে ধর্ষণ করা ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য পশ্চিমা দেশগুলোতে এমন কিছু মুসলমান আছে যারা অমুসলমান নারীদেরকে পাশবিকভাবে ধর্ষণ করে, এবং এর জন্য তারা যুক্তি দেখায়

যে “বোরখা ছাড়া রাস্তায় বের হওয়ায় এটা মহিলার দোষ।” তারা কুরআনের ৪:২৪ এবং ২৩:৬ আয়াত থেকেও যুক্তি তুলে ধরে যাতে যুদ্ধের পর অমুসলমান নারীদেরকে গনিমতের মাল হিসাবে ধরে নিয়ে দাসী বানিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ঐ ধর্ষণকারীরা পাশ্চাত্যের দিকে বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে তাকায় না এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত মনে করে; সুতরাং তাদের নারীদেরকে তারা নিজেদের বৈধ সম্পত্তি ভাবে। যদিও আমি কোন পণ্ডিতকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে শুনিনি। এখানে অভিবাসীদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে।

যে সব পাঠক আশ্চর্য হচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি: কখনো একজনের কথা সত্য বলে ধরে নিবেন না। নিজেরা গবেষণা করুন এবং অন্যদের জিজ্ঞাসা করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নিন। আমি শতভাগ সঠিক নই; বোকারাই নিজেদেরকে সব সময় সঠিক মনে করে।

(Infidel Fakhour -এর Rape in Islam and Its Four Witnesses নামক ইংরাজী নিবন্ধটি ইসলাম ওয়াচ [www.islam-watch.org]-এ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। এটি তার বাংলায় ভাষান্তর। লেখক এখন কানাডার অন্টারিওতে বাস করেন। তিনি কানাডার মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সদস্য। এটি ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন “মুসলিম ব্রাদারহুড”-এর সহযোগী সংগঠন)

বনি ক্বারাইজার হত্যাযজ্ঞঃ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে খুশির দিন

আয়েশা আহমেদ

বনি ক্বারাইযা হত্যাযজ্ঞের দিনটি ছিল মদীনার মুসলিম উমমাহর জন্য সবচেয়ে খুশীর, সবচেয়ে উৎসব মুখর দিন।

নবী ক্বারাইযা গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের (প্রায় ৯০০) শিরোচ্ছেদ এবং নারী ও শিশুসহ তাদের সমুদয় সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল-তাবারী ৮: ৩৮:
"আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিলেন যে, সকল প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদী পুরুষ এবং বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত বালকের শিরোচ্ছেদ করতে হবে। নবী তারপর বনি ক্বারাইযা ইহুদীদের সম্পদ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদেরকে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।"

কোরআনের দু'টি আয়াতে সংক্ষেপে এ ঘটনার উল্লেখ আছে (৩৩: ২৬-২৭):

"তোমরা অনেককে কতল করেছিলে, এবং অনেককে বন্দী করেছিলে... এবং আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন তাদের জমি, তাদের বাড়ীঘর, এবং তাদের জিনিসপত্র ও নারীগণকে, এবং এমন এক জমিনের কর্তৃত্ব যেখানে তোমরা (আগে) যাও নাই।

এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান।”

মদীনার সকল উৎফুল্ল মুসলমান বর্ণাঢ্য শিরোচ্ছেদ প্রদর্শনী এবং ঘটতে যাওয়া নারী বিতরণ দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল। বাজার এলাকায় একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। কয়েকজন পুরুষ ইহুদী পুরুষদের বিবস্ত্র করে তাদের যৌনকেশ গজিয়েছে কিনা তা পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। যাদের তলপেটের নীচে লোম ছিল তাদেরকে কতল করার জন্য বাছাই করা হয় এবং বাকীদেরকে দাস শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুনান আবু-দাউদ, পুস্তক ৩৮, সংখ্যা ৪৩৯০:

আতিয়াহ্ আল ক্কারাজির বর্ণনা করেন: “আমি বনু ক্কারাইজার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা (সাহাবীরা) আমাদেরকে পরীক্ষা করল, এবং যাদের তলপেটের নীচে লোম গজাতে শুরু করেছে তাদেরকে হত্যা করা হল এবং যাদের লোম গজায় নাই তাদেরকে হত্যা করা হল না। যাদের লোম গজায় নাই আমি তাদের একজন ছিলাম।”

তাদের কাপড়চোপড় যুবতীদের জন্য রেখে দেওয়া হয়। নবী হত্যাযজ্ঞের আয়োজন তদারক করেন; আলী, আবুবকর, ওমর ও হামযাসহ অনেক সাহাবা এই শিরোচ্ছেদ সম্পাদন করেন . . . . . দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার এই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন নবী নিজে। তিনি উচ্চস্বরে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে ক্কারাইযা গোত্রের প্রধান কাব বিন আসাদের গলা কেটে ফেলেন। এভাবে হত্যা উৎসব শুরু হয়। গুরুতর আহত মৃত্যু পথযাত্রীর গলা দিয়ে যখন গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল, তখন উপস্থিত নারী-পুরুষ আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিচ্ছিল এবং আল্লাহ ও মুহাম্মদের প্রশস্তিসূচক গান গাইছিল।

আধুনিক কালের ভিডিওতে দেখা যায়, আধুনিক কালের তরুণ জিদাহীরা নবী এবং অন্যান্য মুমিনের সুন্নত অনুসরণ ক’রে যখন অবিশ্বাসী ব্যক্তির দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে তখন তারা আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেয় এবং আল্লাহর হামদ গায়। ব্যাপারটা যেন অনেকটা তেমন। উলঙ্গ ইহুদী পুরুষদেরকে পর্যায়ক্রমে

গর্তের কিনারায় আনা হচ্ছিল এবং তাদের মাথা কেটে ফেলা হচ্ছিল এবং শরীর গর্তে ফেলা হচ্ছিল। প্রতিটি ইহুদীকে হত্যা করার সময় মুসলমান নারী-পুরুষ আনন্দে নাচছিল (৯/১১-তে ফিলিস্তিনীরা যেভাবে নেচেছিল)।

এই হত্যাযজ্ঞ শেষ হওয়ার পর জায়গা-জমি, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং নারী ও শিশুদেরকে বিতরণ করা হয়। প্রথমে পবিত্র নবী তার নির্ধারিত অংশ হিসাবে সবকিছুর শতকরা ২০ ভাগ রেখে দেন। লুঠের মধ্যে অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী রেহানাকে তিনি ভোগ করার জন্য ভাগে পান। বাকী যুবতীদেরকে লটারীর মাধ্যম জিহাদীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বুখারী, খণ্ড ৫, পুস্তক ৫৯, সংখ্যা ৩৬২:

"ইবনে ওমর বর্ণনা করেন: নবী তখন তাদের পুরুষগণকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন. . . . . ।"

"সিরাত এ রাসূলুল্লাহ," ইবনে ইসহাক, পৃ ৪৬৪:

"মদীনায় বনি ক্বারাইযা গেত্রের ৮০০-৯০০ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে মাথা কেটে হত্যা করার এবং গর্তে নিক্ষেপ করার পর নবী তাদের সম্পত্তি, স্ত্রীগণ ও শিশুদের গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ করে দিলেন . . . . তিনি আমর বিন খানুফার কন্যা রেহানাকে নিজের জন্য নিলেন।"

একজন নারী তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের খুনীদের যৌনদাসী হবার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করতে চেয়ে তাকে হত্যা করার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আল-জবিরকে থাবিতের সুপারিশে হত্যা করা হয় নাই, কারণ অতীতে জাবির তার প্রাণ রক্ষা করেছিল। অবশ্য জাবির বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু পছন্দ করেছিল, কারণ তার প্রিয়জনদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। এতে নবী ভীষণ রেগে যান। তিনি চিৎকার করে বলেন, "যাও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে নরকের আগুনে যোগ দাও।" এবং তিনি থাবিতকে নির্দেশ দেন, যেন সে নিজে তার উপকারী বন্ধুর গলা কেটে ফেলে।

আমাদের নবী সুদর্শনা রেহানাকে ভোগ করার জন্য তাড়াতাড়ি ঘটনা স্থল ত্যাগ করেন। শোকাভিভূত এই কিশোরী সকাল বেলায় তার ভাইদের, বাবা ও স্বামীর গলা কেটে ফেলতে দেখেছে। তাকে সারারাত ধর্ষণ করার পর নবী বিয়ের প্রস্তাব দেন, যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সে তার স্বামীসহ আপন প্রিয়জনদের হত্যাকারীর স্ত্রী হতে অস্বীকৃতি জানায়। আমাদের নবী ছিলেন সুন্দরী রমণীদের সত্যিকার গুণগ্রাহী। তিনি তাকে তার হারেমে রক্ষিতা হিসাবে রেখে দেন। এ ব্যাপারটা না মেনে রেহানার উপায় ছিল না।

সেই রাতটি ছিল অনেক অবিবাহিত মুমিনের জন্য অত্যন্ত সুখের। তাদের নবীকে ধন্যবাদ, তারা প্রথমবারের মত নারীদেহ ভোগ করতে পেরেছিল। অনেকে নিজের মনমত অন্য অবিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেছিল, কারণ লটারীতে তাদের ভাগ্যে যুবতী রমণী জোটে নাই। বর্তমান কালের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ১২ বছরের একটি মেয়েকে কয়েকজন তালেবান মিলে ধর্ষণ ক'রে তাদের প্রিয় নবীর সুন্নত পালন করছে। পার্থক্য হচ্ছে ১২ বছর বয়সী যেসব ক্কারাইযা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল তাদের দুঃখে কাঁদার জন্য পরিবারের কেউ অবশিষ্ট ছিল না। পরদিন সকালে আমাদের নবী লক্ষ্য করলেন যে, অনেক যুবক জিহাদী ফজরের নামাজ আদায় করতে আসে নাই। বাধ্যতামূলক নামাজ আদায়ে না আসার জন্য সারারাত জেগে ফূর্তি করা কোন অজুহাত হতে পারে না। তিনি তাদের কুড়েঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। তারা তখন সারারাত ফূর্তি করে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল।

বুখারী, খণ্ড ৬, পুস্তক ১১, সংখ্যা ৬২৬:

"নবী বললেন, 'যারা নামাজের জন্য বাড়ী থেকে বের হয় নাই তাদেরকে পুড়িয়ে মার, তাদেরকে তাদের ঘরের ভিতর জীবন্ত দগ্ধ কর।"

এত বেশী উলঙ্গ জিহাদীকে জ্বলন্ত কুড়েঘর থেকে ছুটে পালাতে এর আগে কখনো দেখা যায় নাই। তাদের দাড়িতে এবং তলপেটের নীচের লোমে আগুন ধরে

গিয়েছিল। খারাপ মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা বিশেষ ধরনের সুন্নত। ভাল মুসলমানরা আজকের দিনেও এ সুন্নত পালন করে। ক্বারাইযা গনিমতের এক পঞ্চমাংশ নবী তার ভাগে পেয়েছিলেন। এটি ছিল তার জীবনে পাওয়া বড় ধরনের লুঠের ভাগ। তার ভাগে একশতর বেশী নারী পড়েছিল। সবচেয়ে সুন্দরী কমবয়সীদের নিজের ভোগের জন্য রেখে বাকী কয়েকজনকে তিনি বন্ধু ও আত্মীয়দের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দেন।তাবারির ইতিহাস (The History of Tabari), খণ্ড ৮, পৃ ২৯-৩০।

নিজের ভাগে পাওয়া নারীদের মধ্য থেকে নবী রায়তাহ বিনতে হিলাল নামে একজনকে যৌনদাসী হিসাবে ভোগ করার জন্য তার জামাতা আলীকে উপহার দেন। তিনি তার জামাতা উসমান বিন আফানকে জয়নব বিন হায়ান নামের আর এক যৌনদাসীকে এবং শ্বশুর ওমর ইবন খাত্তাবকে অজ্ঞাতনামা এক যৌনদাসী উপহার দেন। ওমর যৌনদাসীটিকে তার ছেলে আবদুল্লাহকে দেন। নবীর অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবাদের অধিকাংশই উপহার হিসাবে যৌনদাসী পেয়েছিলেন।

অবশিষ্টদের বিক্রির জন্য নজদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিক্রির টাকা দিয়ে অস্ত্র ও ঘোড়া কেনা হয়।

(তাবারি, খণ্ড ৩৯): "তখন আল্লাহর রাসূল সাদ বিন জায়িদকে কিছু সংখ্যক ক্বারাইযা বন্দীসহ নজদে পাঠালেন। এবং তাদের বিনিময়ে তিনি অস্ত্র ও ঘোড়া কিনলেন।"

(নিবন্ধটি Ayesha Ahmed-Gk Massacre of Bani Quraiza: Muslim Ummah's Happiest Day-এর বাংলায় ভাষান্তর। মূল ইংরাজী নিবন্ধটি রবিবার, ৩১ মে ২০০৯ তারিখে ইসলাম ওয়াচ (www.islam-watch.org)-এ প্রকাশিত হয়)

ইসলামে দাসপ্রথা এবং পাকিস্তানে এর চর্চা

আর্সলান শওকত

ইসলাম কীভাবে দাসপ্রথাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে এবং পাকিস্তানে আজ কীভাবে এর চর্চা হচ্ছে

দাসপ্রথার সাথে ইসলামের সম্পর্ক

তথাকথিত 'শান্তির ধর্ম' ইসলামের রয়েছে দাসপথার দীর্ঘ ও প্রতারণাপূর্ণ ইতিহাস। ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে দাসপ্রথার পক্ষে সমর্থন করে বলা হয়েছে, ৩৩:৫০- "নবী, আমরা তোমাদের স্ত্রীদের বৈধ করেছি যাদেরকে তোমাদের দেওয়া হয়েছে যৌতুক হিসাবে এবং দাসীদেরকে (বৈধ করেছি), যাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন উপহার হিসাবে।"

২৩:৫ "... তাদের স্ত্রীগণ ও দাসীদেরকে মেনে নাও, কারণ এগুলো তাদের জন্য বৈধ।"

মুহাম্মদ তার কপটিক (খ্রীস্টান) দাসী মারিয়ার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ইসলাম লুটের মাল হিসাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধের (জিহাদ) পুরস্কার হিসাবে দাসীদের গ্রহন করা অনুমোদন করে। ইবনে সাল উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ মারিয়াকে পছন্দ করতেন। সে ছিল সুন্দরী, তার গায়ের রঙ ছিল ফর্সা এবং চুলগুলি কোঁকড়ানো। মুহাম্মদ দাসপ্রথা অনুমোদন করেন এবং নিজে এ প্রথা অনুসরণ

করেন। (ইবনে সাদ, কিতাব আল-তাবাকাত আল-কবির, পৃ, ১৫১)।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিবেচিত সহি বোখারীতে দাসপ্রথা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছেঃ

"আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং আবু খুদরিকে দেখলাম এবং তার পাশে বসলাম এবং তাকে বীর্যপাতের আগে যৌনকর্ম বন্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আবু বললেন, 'আমরা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে বনু মুসতালিকের উপর গযওয়া (আক্রমণ) করতে যাচ্ছিলাম। এবং আরব যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে আমরা কিছু পেলাম এবং আমরা নারীদের কামনা করলাম এবং নিজেদেরকে সংযত করে রাখা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল এবং আমরা যৌনকর্ম শেষ না করে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো পছন্দ করলাম। সুতরাং যখন আমরা বীর্যপাতের আগে যৌনকর্ম বন্ধ করতে চাইলাম, 'তখন আমরা বললাম, কীভাবে আমরা আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞাসা না করে বীর্যপাতের আগে যৌনকর্ম বন্ধ করতে পারি যখন তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন?' আমরা (তাকে) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি বললেন, 'তোমাদের পক্ষে এটা না করাই ভাল, কারণ যদি পূর্বনির্ধারিত থেকে যে, কোন আত্মা (রোজ কেয়ামত পর্যন্ত) অস্তিত্ববান থাকবে, তবে তা অস্তিত্ববান থাকবে।" (খণ্ড ৫, # ৪৫৯, ইবনে মুহাইরিযের বর্ণনা)।

উপরের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানরা বনু মুসতালিক থেকে দাস-দাসী নিয়েছিল এবং লুটের মাল হিসেবে তাদের বিতরণ করা হয়েছিল। মুসলমান জিহাদিরা তাদের বিকৃত যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য নতুন আটক করা দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম করতে চেয়েছিল এমনভাবে যাতে তারা গর্ভবতী না হয় এবং বাচ্চা মানুষ করার দায় এড়ানো যায় এবং নিজেদের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার পর উপযুক্ত মূল্যে দাসীদের বিক্রি করা যায়।

কতটা বিকৃতি!

এই হাদীস প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ মহিলা বন্দীদের ধর্ষন করা অনুমোধন করেছিলেন। একই ধরনের আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

“বানু তামীমের একটি শাখা বানে আল-আনবারের বিরুদ্ধে গযওয়া (আক্রমণ) চালানো হয়েছিল। নবী তাদের উপর হামলা করতে উয়াইনাকে পাঠিয়েছিলেন। সে তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের কিছু লোককে হত্যা করে এবং অন্যদেরকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। (খণ্ড ৫, অধ্যায় ৬৭ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা)।

পাকিস্তানে দাসপ্রথা

এতে অবাক হবার কিছু নাই যে, মুসলিম দেশগুলো দাসপ্রথা বেশ জোরালোভাবে অব্যাহত রেখেছে। পুরুষ এবং নারী উভয় ধরনের দাসদের ধরে রাখা, ক্রয় করা, বিক্রয় করা, নির্যাতন করা এবং ধর্ষন করার প্রতারণাপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানের।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে ইসলাম ধর্মের রয়েছে আধিপত্যমূলক মর্যাদা। সরকারিভাবে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম। ইসলামী শরীয়া সে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিয়াবে বলবত হয়েছে। ন=সকল আইনকে সংশোধন ও পূনর্বিন্যাস করা হয়েছে কুরআনের বিধিনিষেধ মোতাবেক। বর্তমান সংবিধান, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকার হচ্ছে অগণতান্ত্রিক। পাকিস্তানে ধর্মীয় শাসন চলছে। এই পরিবেশে অবাক হওয়ার কিছু নাই যে, মুসলমানরা দাসপ্রথার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এবং এর শিকার হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে খ্রিস্টানরা।

পাকিস্তানে দাসপ্রথা ব্যাপক। এর রয়েছে নানা ধরন-ধারণ। সেখানে রয়েছে মুচলেকা দিয়ে ক্রীতদাস প্রথা। এ ক্ষেত্রে গোটা পরিবার দশকের পর দশক

ক্রীতদাস থেকে যায়। ইটের ভাটা, কার্পেট বুনন, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদিতে সাধারণত এ প্রথা চালু আছে। তারপর সেখানে আছে মুচলেকা দিয়ে শিশু দাসপ্রথা। এক্ষেত্রে গরীব বাবা-মা মুচলেকা দিয়ে তাদের সন্তানদের ধনী পরিবারের কাছে বিক্রি করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৬-১২ বছরের মেয়েদের বিক্রি করা হয়।

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট মুচলেকা দিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমদান অসাংবিধানিক ঘোষনা করেছে। কিন্তু পাকিস্থান সরকার এ আইন কার্যকর করে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কেন এমন ঘটল তা ভাবতে গিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নাই। এর কারণ ইসলাম দাস এবং মুচলেকায় আবদ্ধ শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করাকে বৈধতা দিয়েছে। কার্পেট শিল্প ও কৃষি খাতে গোটা পরিবার মুচলেকায় আটকে পরে শ্রমিক হয়ে যায়। এমনকি শিশুদেরকে শ্রমদানে বাধ্য করা হয় এবং তাদের মা-বাবার নেওয়া ঋণের দায়ে মুচলেকায় আটকে ফেলা হয়। এই শিশুরা স্কুলে যাওয়ার অথবা খেলা করার সুযোগ পায় না। তারা শুধু কাজ করে এবং প্রায়ই নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।

পাঞ্জাবী ইট-ভাটাগুলো এমন এক কেন্দ্র যেখানে মুচলেকায় আবদ্ধ হয়ে দাস বনে যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা। এই দাসেরা সাধারণত সংখ্যালঘু খ্রীস্টান পরিবার হয়ে থাকে। দাসদের দৈনিক ২ ডলারেরও কম মজুরী দেয়া হয়। তাদের কাজ করতে হয় সূর্যোদয় থেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় এই দাসদের দুর্ভোগ সম্পর্কে জানাজানি হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি সরকার সব সময় ধামাচাপা দিয়ে রাখে। সাধারণ মানুষও খ্রীস্টান দাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়।

পাকিস্তানের কৃষিখাতে মুচলেকায় আবদ্ধ দাসত্ব ব্যাপক। দক্ষিণ-পূর্ব পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে হায়দরাবাদের পূর্বে সেচ সমৃদ্ধ কৃষি খামারগুলোতে আনুমানিক ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ কৃষি শ্রমিক ঋণের মুচলেকায় আটকে আছে। সংঘর, মিরপুরকাস ও উমরকোট জেলার কৃষি খামারগুলোতে কর্মরত কার্যত সকল দাস শ্রমিকই স্থানীয় পাকরি সম্প্রদায়ের। তাদের আদিনিবাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব সিন্ধুর

মরুভূমিতে।

প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, ঋণের দায়ে আবদ্ধ দাস শ্রমিকেরা হচ্ছে হিন্দু, যারা মুসলমান জমিদারদের যমিতে কায করে।

করাচী ভিত্তিক এনজিও পিলার শমিকদের শিক্ষা প্রকান ঈ গবেষণার ক্ষেত্রে কায করছে। এই প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপাদের মর্মনিরীক্ষণমূলক অনেক কাজ করেছে। এতে পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক শ্রমপ্রদান অতি সাধারণ ঘটনা এমন ৯টি খাত চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- গৃহনির্মাণ, কার্পেট বুনন, খনির কাজ করা, কাঁচের চুড়ি, চামড়া শিল্প, গৃহস্থালি কাজ, ভিক্ষাবৃত্তি, কৃষি এবং ইট-ভাটা।

মুচলেকায় আবদ্ধ দাস শ্রমিকদের মুক্তির জন্য কর্মরত প্রধান মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান জানিয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিশেষ করে সিন্ধু প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে দোদুল্যমান থাকে। জমিদার এবং তাদের দালালরা মুচলেকায় আবদ্ধ সাবেক শ্রমিকদের অপহরন করে নিয়ে গেছে এমন 'শ্রমিক ধরার' অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। (কখনো কখনো একজন করে ধরা হয়, কোন সময় ছোট দল এবং দু'বার অনেককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে)।

মানবাধিকার লংঘনের মধ্যে আরো রয়েছেঃ মুচলেকায় আবদ্ধ নারী শ্রমিকদের ব্যাপক হারে পাশবিক ধর্ষন, অপহরন, বেআইনিভাবে আটকে রাখা, শিশুদের অর্থনৈতিক শোষন এবং শিক্ষার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার ঘটনা।

কোন কোন সময় এই মুচলেকার দায় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের উপর বর্তায়। লিখতে ও পড়তে পারে না এবং পুরোপুরি ঋনদাতাদের করুণার উপর নিরভরশীল বিধায় শ্রমিকরা পরিণতি কী হবে তা না বুঝেই মুচলেকায় টিপসই দিয়ে দেয়। এমনকি তারা পরিণতির কথা বুঝলেও চরম দারিদ্রের কারণে তাদের সামনে অন্য পথ খোলা থাকে না। তদুপরি কত টাকা লেনদেন হল তা লেখা হয় না।

শ্রমিকরা কত টাকা নিল সে জন্য তারা কোন রশিদ পায় না।

মুচলেকায় আটকা পড়া (দাসত্ব) শ্রমিকদের সংখ্যা আনুমানিক ৬০ লাখ হবে।

পাকিস্তানের পত একটি ইসলামী সমাজে মুচলেকায় আবদ্ধ শ্রমকে কুরআন এবং সুন্নাহ বৈধতা দিয়েছে বলে গণ্য করা হয়। শুধু এই ঘটানাই দাস প্রথার এমন রমরমা হওয়ার অন্যতম চালিকা শক্তি।

এই বিবর্ণ চিত্রের বিপরীতে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, অনেক মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং মুচলেকায় আবদ্ধ এ ধরনের শ্রমিকদের মুক্তি ও পূনর্বাসনের জন্য মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তবে মুচলেকার দায়ে শ্রম আদায়ের অশুভ প্রথা নির্মূল করতে হলে আরও ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন।

অতীতে সরকার, বিচার বিভাগ ও মুসলিম সমাজ মুচলেকায় আটকে পড়া শ্রমিকদের মুক্তি ও পূনর্বাসনের জন্য তৎপর হয়েছে। এনজিওদের, বিশেষ করে মানবাধিকার গ্রুপগুলোর পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগের ফলে গত ১৫ বছরে মুচলেকায় আবদ্ধ হারি সম্প্রদায়ের ৫,৬৮৭ জন এবং অন্য আরও ৮,৫৩০ জন শ্রমিক মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, এই সাফল্য সমুদ্রের তুলনায় একফোঁটা পানির মত।

এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়া মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে জনগণকে উদ্বোদ্ধ করতে আরও অনেক কিছু করতে হবে। সর্বোপরি ভূস্বামী ও ইটভাটার মালিকদের বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রমিকরা অপব্যবহার করার পাত্র নয়।

সম্প্রতি লাহোরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর হাতে শাযিয়া মসিহ নামের ১২ বছরের এক খ্রীস্টান তরুনী ক্রীতদাসীর মৃত্যুর ঘটনায় পাকিস্তানে দাসপ্রথা জনিত দুর্ভোগের চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। তার মালিক তাকে ইসলামী মতে বৈধভাবে ধর্ষণের পর হত্যা করে। মিডিয়ায় ঘটনাটি ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনার

পুনরাবৃত্তি রোধের সরকার সুনির্দিষ্ট কি পদক্ষেপ নে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

পাকিস্তানের মত একটি ইসলামী সমাজে দাসপ্রথা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত পরিবর্তন হবে তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম দাসপ্রথাকে বৈধতা দিয়েছে। দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামী বিধি-বিধানের সমালোচনা অবশ্যই করতে হবে এবং এই নষ্টামী নির্মূল করার জন্য অবশ্যই আরও আন্তর্যাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

আবার, ইসলামী সমাজগুলোকে দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই ইসলামকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে সবার আগে; কারণ দাসপ্রথা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সকল ফোরামে এই ইস্যুটি তুলে ধরা তাদের দায়িত্ব, যারা ইসলামের ইতিহাস এবং দাসপ্রথার সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশয়ে সচেতন।

(নিবন্ধটি পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত লেখক ArslanShaukatকর্তৃক লিখিত Slavery in Islam and Its Practice in Pakistan-এর বাংলায় ভাষান্তর। এটি ওয়েব ইসলাম ওয়াচ [www.islam-watch.org] এ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত হয়।)

ইসলামের সংস্কার একটি অলীক কল্পনা

আলী সিনা

ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে ধন্যবাদ যে, তার কারণে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিমারা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, কোথায় মধ্যপন্থী (মডারেট) মুসলমানরা? এটা ঠিক যে, তাদের কারোরই কোন অস্তিত্ব নাই। চিন্তাটাই অবাস্তব। মুসলমানরা বিষয়টাকে ভিন্নভাবে দেখে। আপনি হয় একজন সাচ্চা দীনী মুসলমান হবেন, নয় কমজোরী মন্দ মুসলমান হবেন। এই শেষ দলকেই পশ্চিমারা ভুল আখ্যায় মডারেট বা মধ্যপন্থী মুসলমান হিসাবে শনাক্ত করে। মুসলমানরা যখন নিজেদেরকে মধ্যপন্থী হিসাবে দাবী করে তখন বলতে হয় তারা "ভণ্ড"।

আসলেই ইসলাম একটি মন্দ ধর্ম। ইসলামের প্রকৃত সমস্যা কেবলমাত্র তার অনুসারীদের মধ্যে নাই, বরং এটা আছে প্রকৃতপক্ষে তার গ্রন্থের মধ্যে। এই বিষয় নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে তার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর মুসলমান "ইসলামের সংস্কার"-এর ধারণা হাজির করেছে। এই ধরনের অল্প সংখ্যক "সংস্কারক" বা সংস্কারপন্থীরা পশ্চিমাদের কাছ থেকে কিছু স্বীকৃতি লাভ করেছে, যদিও সমধর্মাবলম্বী মুসলমানদের ব্যাপক অংশের মধ্যে তাদের কোন পাত্তা নাই এবং তাদের কাছে তারা তামাশার পাত্র।

ইসলামকে সংস্কার করা যায় কি না এখন এই বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করতে চাই।

আসুন আমরা সংস্কারের ইংরাজী শব্দ reform এর বুৎপত্তিগত অর্থ বিবেচনা করি। ইংরাজী reform শব্দটি লাটিন reformare শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ হলো পুনরুদ্ধার করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া, নবায়ন করা। এই সবগুলি শব্দ যা বুঝায় তা হচ্ছে কোন কিছুকে তার মূল রূপে ফিরিয়ে নেওয়া।

ইসলামের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খৃষ্টান ধর্মের সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

খ্রীষ্টধর্মের সংস্কার

খীষ্টধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টা হিসাবে সংস্কার চেষ্টা শুরু হয় নাই। বরং এটা হয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার প্রয়াস হিসাবে। অনেক বিশ্বাসী চার্চ এবং তার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিরক্ত ছিলেন। যেমন, স্বর্গের জন্য টিকিট বিক্রয় এবং চার্চের পদ কেনাবেচা করা। তারা এগুলিকে চার্চের ভিতরকার ভূয়া বা ভ্রান্ত মতবাদ এবং অপকর্ম হিসাবে বিবেচনা করতেন।

মার্টিন লুথার, উলরীখ জুয়িংলি, জন ক্যালভিন এবং অন্য সংস্কারকগণ এগুলির বিরুদ্ধে এবং চার্চের অন্যান্য কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। যেমন, পাপ মোচনের বন্দোবস্ত, মেরীর আরাধনা, সাধু-সন্তদের আরাধনা এবং তাদের মধ্যস্থতা সংক্রান্ত ধারণা, বেশীর ভাগ ধর্মানুষ্ঠান, যাজক মণ্ডলীর জন্য বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য (সন্ন্যাসব্রতসহ) এবং পোপের কর্তৃত্ব।

এগুলির কোনটাই খ্রীষ্টধর্মের মতবাদ ছিল না। এগুলি ছিল চার্চের অনুশীলন। সংস্কারকগণ চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তারা বাইবেলের কর্তৃত্বকে

অস্বীকার করেন নাই। তাদের পরামর্শ ছিল বাইবেলকে আক্ষরিকভাবে পাঠ করা হোক। তারা বাইবেলের রূপকল্পমূলক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বাইবেলের পুরাতন বা এবং নূতন নিয়মকে সংবিধিবদ্ধ আইন হিসাবে গ্রহণ করেন। শব্দগুলোর অর্থ সেটাই যেটা বলা হয়েছে। কোন জটিলতা, দ্বন্দ্ব অথবা দুর্বোধ্য অর্থ যদি ঘটে তবে সেটার জন্য মূল গ্রন্থ দায়ী নয়, তার জন্য দায়ী হবে পাঠক।

ধর্মগ্রন্থে সপষ্টভাবে এবং আক্ষরিকভাবে যেটা বলা নাই সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং ধর্মগ্রন্থে যেটা সপষ্টভাবে এবং আক্ষরিকভাবে বলা হয়েছে সেটাকে অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে।
এটাই হচ্ছে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মূল কথা।

ইসলামী সংস্কার

ইসলামেও অনুরূপ সংস্কার ঘটেছিল। এই সংস্কারের নাম হচ্ছে “সালাফীবাদ”। অনেক পশ্চিমা ভুল করে বিশ্বাস করেন যে, মোহাম্মদ ইব্ন আব্দ-আল-ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২) হচ্ছেন ইসলামের একটি চরমপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এটা সত্য নয়। আব্দুল ওয়াহাব কোন নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। লুথার যেমন খ্রীষ্টান ধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন একইভাবে তিনিও তেমন ইসলাম ধর্মের একজন সংস্কারক ছিলেন।

আব্দুল ওয়াহাবের চিন্তার মূল জায়গাটা হচ্ছে এই যে, মোহাম্মদ এবং তার সাহাবীগণের সময়ে ইসলাম ছিল বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ। ইসলামের পতনের কারণ হলো ইসলামের বিশুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুতি (বিদাহ্)। ইসলামের প্রাথমিক যুগের তিন প্রজন্মের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে এবং অনৈসলামিক প্রভাব বহিষকারের মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটবে।

ইসলাম যে তার প্রাথমিক পর্যায়ে বিশুদ্ধ ছিল সে কথা কুরআনে (৫:৩) বলা হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

আব্দুল ওয়াহাব বললেন যে, যে কোন পরিবর্তন কিংবা নূতন কিছু প্রবর্তন করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত। এবং তাদের উচিত সালাফ (পূর্বপুরুষগণ কিংবা আদিপুরুষগণ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আর এভাবেই সালাফী নামের উদ্ভব হয়।

সালাফীর দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ হচ্ছে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ধার্মিক পূর্বপুরুষগণ।

এই বিশ্বাস আব্দুল ওয়াহাবের উদ্ভাবন নয়, বরং এটার ভিত্তি হচ্ছে একটা হাদীস, যেখানে মোহাম্মদ বলছেন,

"আমার প্রজন্মের লোকরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, এর পরে যারা আসবে তাদের স্থান তার পরে, এবং তার পরের স্থানে থাকবে তারা যারা তাদের পরে আসবে (অর্থাৎ মুসলমানদের তিনটি প্রথম প্রজন্ম)" (বুখারী ৩:৪৮; ৮১৯ এবং ৮২০ এবং মুসলিম ৩১:৬১৫০ এবং ৬১৫১।) [তাবিঈন এবং তাবা আৎ-তাবিঈন]

আব্দুল ওয়াহাব সালাফীবাদের প্রতিষ্ঠাতা পাশ্চাত্যের এই অতিকথা বা মিথ ধ্বংস করার জন্য এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইব্‌ন তাইমিয়াহ্‌ও (১২৬৩-১৩২৮) ছিলেন একজন সালাফী। ইব্‌ন তাইমিয়াহ মোহাম্মদের জন্মদিন উদযাপনের বিরোধিতা করতেন এবং সুফী সাধুদের মাজার-দরগা নির্মাণের বিরোধিতা করতেন। তার মতে, "তাদের অনেকে (মুসলমানরা) এমনকি এ কথাও জানে না যে, এই সব আচার-অনুষ্ঠান এসেছে খ্রীষ্টান (ক্যাথলিক) ধর্ম থেকে। খ্রীষ্টধর্ম এবং তার অনুসারীরা অভিশপ্ত হোক।"

সালাফ শব্দটিকে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, আবু সাদ্‌ আব্‌দ আল করীম আল সামানী-এর বই "আল-আন্‌সাব"-এ। আল করীম মৃত্যু বরণ করেন ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে

(ইসলামী পঞ্জিকা অনুসারে ৫৬২ হিজরী)। আল সালাফী শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এটা সালাফ বা পূর্ববর্তীগণ থেকে এসেছে। আমি যা শুনেছি সে অনুযায়ী এটা হচ্ছে তাদের চিন্তাধারার অভিযোজন।" এর পর তিনি আরও কিছু সংখ্যক লোকের দৃষ্টান্ত দেন যারা এই ধারণাকে ব্যবহার করে।

সালাফীরা নিজেদের আইনসমমত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মোহাম্মদের একটি হাদীস উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলছেন,

"আমি তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সালাফ" (সহীহ্ মুসলিম: ২৪৫০)।

ইসলামের সংস্কার এবং তার আদি বিশুদ্ধ পর্যায়ে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা আব্দুল ওয়াহাবকে দিয়ে শুরু হয় নাই। এটা প্রকৃতপক্ষে একটা পুরাতন চিন্তা। অবশ্য আব্দুল ওয়াহাব এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। সৌদী রাজাদের বদৌলতে তার এই সাফল্য এসেছিল, যারা ছিল তার এক কন্যার মাধ্যমে তার বংশধর।

খ্রীষ্টান সংস্কার এবং ইসলামী সংস্কারের মধ্যে সাদৃশ্য

প্রটেস্ট্যান্টবাদ এবং সালাফীবাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমটা মেরী এবং সাধুদের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য এবং তাদের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীটা মোহাম্মদের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে ইসলামী পবিত্র পুরুষদের বিশেষ ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারণাকে (শিয়াবাদের মধ্যে যে আচার-অনুষ্ঠান আছে) প্রত্যাখ্যান করে। দুই সংস্কার আন্দোলনই তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসকে আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চায় এবং এই ধর্ম দুইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মৃত্যুর পরে যে সব পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছিল সেগুলিকে পরিহার করতে চায়।

ডেমোক্র্যোটদের প্রেসিডেনশিয়াল কনভেনশনে যে আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়

সেখানে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ডঃ ইনগ্রিড ম্যাট্সন নামে এক মহিলাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি উত্তর আমেরিকার ইসলামী সমাজ (আইএসএনএ)-এর সভাপতি। তাকে যখন ওয়াহাবী মতবাদ ইসলামের চরম দক্ষিণপন্থী সম্প্রদায় কি-না এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন,
"না, ওয়াহাবী মতবাদকে এইভাবে চিহ্নিত করা ঠিক না। এটা এই ধরনের কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায় নয়। শত শত বৎসর ধরে যেসব সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং কঠোর ব্যাখ্যা ইসলামের উপর চেপে বসেছিল সেগুলি থেকে ইসলামকে মুক্ত করার জন্য দুইশত বৎসর আগে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এটা হচ্ছে সেই আন্দোলনের নাম। এটা সত্যিই ইউরোপীয় প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের অনুরূপ।
http:/www.thewahabimyth.com/intellectuals.htm

খ্রীষ্টধর্ম সংস্কারের ফল

পরিধিগত এবং পদ্ধতিগত ভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম-সংস্কার এবং ইসলামী ধর্ম-সংস্কার প্রায় একই রকম হলেও দু'টির ফল হয়েছে খুব বেশী রকম ভিন্ন। বাইবেলের আক্ষরিক পাঠ প্রটেস্ট্যান্ট সমাজসমূহের সামাজিক তত্ত্ব ও সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। উপরন্তু তা আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশসমূহে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

এই সংস্কারকগণ আক্ষরিক অর্থে ইউরোপের দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক পটভূমিকে বদলে দিয়েছেন। আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেখানে এখনও সমাজ সংগঠনের প্রটেস্ট্যান্ট তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা মূলত ক্যালভিনবাদী। অন্য কথায় এর সামাজিক সংগঠন খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।
ক্যালভিন এবং জুইংলির মত অনুযায়ী শুধু যে ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক পাঠের উপর

সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তাই নয়, বরং চার্চ সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সমাজের নিজেরও প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এই আক্ষরিক পাঠের উপর।

লুথার পোপ লিওকে একটি চিঠি লেখেন (যেটা তাকে চার্চ থেকে বহিষকারের কারণ হয়) যেখানে তিনি তার ধারণার সারবস্তু ব্যাখ্যা করেন। চিঠির শিরোনাম ছিল "খ্রীষ্টানদের স্বাধীনতা সম্পর্কে"। এই চিঠিটি লুথারের চিন্তার নির্যাসকে তুলে ধরেছে। লুথারের মত অনুযায়ী খ্রীষ্টধর্মের মর্মকথা হচ্ছে "স্বাধীনতা" অথবা "মুক্তি"।

এটা হচ্ছে সেই ধারণা যেটা পরিণামে "ব্যক্তি স্বাধীনতা", "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" এবং "অর্থনীতির স্বাধীনতা" ধারণার উত্থান ঘটায়।

ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির বেশীরভাগ জুড়েই আছে স্বাধীনতা এবং মানুষের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই মুক্তি হচ্ছে মানুষকে মিথ্যা বিশ্বাস থেকে, মিথ্যা ধর্ম থেকে, স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব ইত্যাদি থেকে মুক্তিদান যেটাকে বলা হয় "মুক্তির ভাবনা।" পাশ্চাত্যবাসীরা আজ অবধি এই আলোকপ্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছে।

এই কারণে আমেরিকা প্রথমে কুয়েতকে এবং তার এক দশক পরে ইরাকীদের মুক্তির জন্য ইরাকে আগ্রাসন চালায়। এই কারণেই আমেরিকা বিদেশে প্রায় চল্লিশটি যুদ্ধ করেছে; জাপান থেকে জার্মানী এবং ইতালী, পানামা থেকে নিকারাগুয়া, ভিয়েতনাম থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত তাকে এইসব যুদ্ধ করতে হয়েছে। আপনি এইসব যুদ্ধ সমর্থন করেন বা না করেন উদ্দেশ্য সব সময় এক থেকেছে, সেটা হচ্ছে জনগণকে মুক্ত করা। গণতন্ত্রের এই ধারণা যা আমেরিকার আন্তর্জাতিক কর্মনীতিতে এতটা বদ্ধমূল হয়ে আছে সেটা এসেছে লুথারের "স্বাধীনতার" ধারণা থেকে।

ইসলামে সংস্কারের ফল

ইসলামের সংস্কারের মর্মবস্তু কী? ওয়াহাবীদের বিশ্বাসের মর্মবস্তু হচ্ছে এই যে, মানুষ স্বাধীন নয়, বরং আল্লাহর দাস; জনগণ হচ্ছে “ইবাদ” (দাসসমূহ)। এই ধরনের ভাবনা প্রটেস্ট্যান্টবাদের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। এবং এইখানেই রয়েছে খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যকার মৌল পার্থক্য।

খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে দৃশ্যমানভাবে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্মই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, উভয় ধর্মেই মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যখানে নবী রয়েছে, উভয় ধর্মই মুক্তির পথ সন্ধানী, এবং উভয় ধর্মেই নরক, স্বর্গ এবং পরজীবন ইত্যাদি আছে। তবে মর্মগতভাবে উভয় ধর্মই যে খুব বেশী রকমভাবে পরসপর থেকে ভিন্ন শুধু তাই নয়, বরং তারা পরসপর বিরোধী। মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের অনুসারীরা যেভাবে দাবী করেন সেভাবে ইসলাম মোটেই খ্রীষ্টধর্মের ধারাবাহিকতা নয়। বরং এটার মর্মবস্তু খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী। এই ধর্মবিশ্বাস দুইটির প্রথমটি মানুষের স্বাধীনতার প্রবক্তা এবং অন্যটি মানুষের দাসত্বের প্রবক্তা। একটা মুক্তির বাণী নিয়ে আসে, অন্যটি আত্মসমর্পণের।

স্বাধীনতার ভাবনা যেটা খ্রীষ্টধর্মে এত গুরুত্বপূর্ণ সেটা ইসলামের ধারণার বিপরীত। যখন মুসলমানরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে যেখানে দেখতে পান লেখা আছে “গণতন্ত্র হচ্ছে ভণ্ডামি” এবং “স্বাধীনতা নিপাত যাক” তখন বুঝবেন তারা ইসলামের প্রকৃত মর্মবস্তুকেই তুলে ধরছে, যা হল স্বাধীনতা বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, দাসত্বপন্থী এবং আত্মসমর্পণবাদী।

প্রকৃত মুসলমানদের বাছাইয়ের স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়, বরং তাদের উচিত মোহাম্মদকে অনুসরণ করা। কুরআনের ৩৩:৩৬-এ বলা হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো সপষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।" (কুরআন - ৩৩:৩৬)

মুসলমানদের জন্য কোনটা ভালো এটা তাদের উপর নির্ভর করে না। তাদের জন্য সিদ্ধান্ত ঠিক করাই আছে, তারা পছন্দ করুক বা না করুক তাদেরকে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে নির্দেশ মান্য করা।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যাহা অপছন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।" (কুরআন - ২: ২১৬)

নিজ নাম অনুযায়ী ইসলামের নির্যাস হচ্ছে বশ্যতা স্বীকার তথা আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্ই সব চেয়ে ভাল জানেন। সুতরাং তার শেষ দূত মহাম্মদের মাধ্যমে তিনি যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন সকল মানুষকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

গণতন্ত্র মানে, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে মানুষ আইন তৈরী করে। ইসলামে আপনি সেটা করতে পারেন না। ইসলামে আইন আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। এইসব আইনকে যদিও যুক্তিবিরোধী এবং নিপীড়ক মনে হয় তবু মানুষ সেগুলিকে মানতে বাধ্য।

এই কারণেই মুসলমানরা ব্যভিচারীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ কিংবা ইসলাম ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যার বিরোধিতা করতে পারে না।

খ্রীষ্টান এবং ইসলাম উভয় ধর্মই সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে। দুই ধর্মই অভিন্ন পথ

এবং পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু তাদের সমাপ্তি হয়েছে সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরুতে। যেখানে খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্কার এনেছে স্বাধীনতা, আলোক প্রাপ্তি এবং গণতন্ত্রকে সেখানে ইসলামী সংস্কারের পরিণতি ঘটেছে অজ্ঞতা, মানুষের দাসত্ব এবং জিহাদে।

ইব্ন তাইমিয়াহ্ এবং ইব্ন আব্দুল ওয়াহাব ইসলামের সংস্কারক ছিলেন। সমকালীন ইসলামী সংস্কারকদের মধ্যে আমরা যাদের নাম উল্লেখ করতে পারি তারা হচ্ছেন মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) যিনি কুরআনের একটি ব্যাখ্যা লিখেছিলেন এবং সাঈদ কুত্ব (১৯০৬-১৯৬৬) যিনি ছিলেন পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নেতৃত্বকারী বুদ্ধিজীবী এবং যিনি কি না আবার ছিলেন আয়াতুল্লাহ খোমেনী এবং বিন লাদেনসহ সকল ইসলামী সন্ত্রাসবাদীর আদর্শিক প্রেরণাদাতা ।

সংস্কার বনাম রূপান্তর

আজকের দিনে যে সকল তথাকথিত ইসলামী সংস্কারক ইসলামের সংস্কারের কথা বলছেন তারা যেটা চাইছেন সেটা আসলে সংস্কার নয়, বরং রূপান্তর। উপরে উল্লিখিত সংস্কারকদের বিপরীতে এইসব নূতন সংস্কারকগণ ইসলামের উৎসে যেতে চান না, বরং তারা কুরআনের অংশ এবং গোটা শরীয়াকে পরিহার করে একটা সম্পূর্ণরূপে নূতন ধর্ম প্রবর্তন করতে চান, অথচ এটাকে তারা নাম দিতে চান ইসলাম।

এটা একটা বিভ্রান্ত চিন্তা এবং যৌক্তিক ও ব্যবহারিক উভয়ভাবেই এটা অবাস্তব। কুরআনেও এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই নয়া সংস্কারকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে একটা ভিন্ন রূপ দান করা। অন্য কথায়, তারা ইসলামে "বিদা" (পরিবর্তন) আনতে চায়। এটা কি সম্ভব? কুরআন যে কথা বলেছে, একজন বিশ্বাসী কি তার বিপরীত কোন মত ধারণ করতে পারে? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ৩:৩৬ দ্বারা এ কথা সপষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে সব বিষয়ে আল্লাহ

এবং তার নবী তাদের মতামত জানিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে ভিন্ন কোন ধরনের মত পোষণের অধিকার বিশ্বাসীদের নাই। ধর্মের জন্য কোনটা ভালো সেটা তারা কীভাবে ঠিক করবে?

কুরআনের যখন বলা হয় তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে তখন এটা পছন্দ না হলেও বার্তাটা সপষ্ট। এটা ঈশ্বর বলছেন। ঈশ্বরের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপনি কীভাবে যাবেন? একবার আপনি ঈশ্বরের বাণী হিসাবে কুরআনকে মেনে নিলে তারপর আপনি আপনার ইচ্ছামত যেখান থেকে ইচ্ছা নিবেন অথবা বাদ দিবেন সেটা তো চলবে না। এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।” (কুরআন - ২: ৮৫)

أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيَ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً

“বল, তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব - যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুসপষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন!” (কুরআন - ৬: ১১৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।” (কুরআন - ৬:১১৬)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।" (কুরআন - ২:১৭৪)

এ ছাড়াও দেখুন:
"সেই দিন আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের বিষয়ে একজন সাক্ষী এবং তোমাকে (মোহাম্মদকে) আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে সপষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।" (কুরআন - ১৬:৮৯)

"আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।"
(কুরআন - ৩৯:২৩)

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ:

"যেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম বিভক্তকারীদের উপর; যাহারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছে (অর্থাৎ কুরআনের কিছু অর্থ গ্রহণ করা, কিছু অর্থ বর্জন করা।)। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই। (কুরআন - ১৫:৯০-৯২)

وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ

আল্লাহ্‌র আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। (কুরআন - ৬:৩৪)

لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহাসাফল্য।” (কুরআন - ১০:৬৪)

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا

“তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে পাঠ করিয়া শুনাও। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।” (কুরআন - ১৮:২৭)

কীভাবে একজন মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস আছে এ কথা দাবী করার পর এই সতর্কবাণীগুলিকে অস্বীকার করতে পারে?

ইসলামের তথাকথিত সংস্কারকরা সবচেয়ে ভালো হলে ভ্রান্ত পথচারী আর সবচেয়ে খারাপ হলে কপট। তাদের প্রচেষ্টাকে খুব ভালোভাবে নেওয়া উচিত নয়। তাদের উদ্দেশ্য ভালো অথবা মন্দ যাই-ই থাক তারা মানুষকে প্রতারিত করছে আর এইভাবে একটি অত্যন্ত অশুভ এবং বিপজ্জনক বিশ্বাসকে বৈধতা দিচ্ছে।

একমাত্র সত্য আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে। সুমিষ্ট আবরণ দিয়ে ইসলামের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। আপনি কোন পানিকে বিশুদ্ধ করতে পারেন। আপনি এমনকি আপনার প্রস্রাবকে পানীয় জলে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি গ্যাসোলিনকে (পেট্রল) যতই বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেন এটাকে কি আদৌ পানযোগ্য করতে পারবেন? ইসলামের মর্মবস্তু হচ্ছে অশুভ। আপনি যতই সংস্কারের চেষ্টা করেন না কেন, আপনি এটাকে মানবিক বিশ্বাসে পরিবর্তন করতে পারবেন না। আপনি কি নাৎসিবাদকে সংস্কার করতে পারবেন? গোটা ধারণাটাই হচ্ছে বিভ্রান্ত

এবং অবাস্তব। এটা (সংস্কার) জগাখিচুড়ি অথবা ছলনা। জিহাদ দুইটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই স্তম্ভ দুইটি হচ্ছে যুদ্ধ এবং প্রতারণা। আমি চাই না মুসলমান সংস্কারকদের মিথ্যা আশ্বাসে কেউ বোকা বনুক। মধ্যপন্থী বা নম্র ইসলামের কোন অস্তিত্ব নাই। এটা একটা মিথ বা অতিকথা মাত্র।

শরীয়া বিরোধী এই মুসলমানদের তুলনায় আমি বরং জিহাদী মুসলমানদেরকে বেশী সম্মান করি। জিহাদীদের বেলায় আমি আমার শত্রুকে চিনতে পারি। শরীয়া বিরোধী মুসলমানদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাদেরকে বুঝি না। তাদের কথা অর্থহীন। তাদের উদ্দেশ্য কী তা আমি জানি না। আমি সেই সব লোকদেরকে বিশ্বাস করি না যারা বলে আমি মোহাম্মদের অনুসারী, কিন্তু আমি মোহাম্মদকে অনুসরণ করি না। তাদের দাবী সন্দেহজনক, অসৎ এবং প্রতারণামূলক। আপনি মুসলমান হলে মুসলমানই হোন। আমি আপনার সঙ্গে একমত হব না। কিন্তু আমি অন্তত জানব যে আপনি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং নিজ নিরাপত্তার জন্য আমাকে কোন জায়গায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আপনি যদি এখন একজন মুসলমান হন এবং এখন ইসলাম এবং শরীয়া বিরুদ্ধ হন তবে আপনাকে আমি বিশ্বাস করব না। আপনি হয় মূর্খ, নয়ত বদমাইশ। আপনি উষ্ণ বা শীতল কোনটাই না। আমার সাফ কথাটাই আপনাকে বলব।

কিছু সংখ্যক তথাকথিক সংস্কারক জিহাদীদের থেকে তাদের ভয়ের কথা শুনিয়ে নিজেদের পরিচিতি এবং চেহারা গোপন করে। তারা আমেরিকানদেরকে ধাপ্পা দিতে চাচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজী।

ইসলামের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কিন্তু এটাকে পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে গেলে আপনাকে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব পেতে হবে। একমাত্র ঈশ্বরই তার কথার পরিবর্তন করতে পারেন। সেই স্বর্গীয় কর্তৃত্ব কোথায়? ইসলামের একমাত্র সৎ সংস্কারক ছিলেন বাহাউল্লাহ্। তিনি বুঝেছিলেন ইসলামের সংস্কার সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি নিজেকে ঈশ্বরের নূতন অবতাররূপে ঘোষণা করেন। এবং ঘোষণা করেন যে তার

মাধ্যমে ঈশ্বর নূতন বাণী পাঠিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কুরআনে প্রদত্ত তার পূর্ববর্তী সকল অনুশাসনকে বাতিল করেছেন।

সুতরাং তিনি মুসলমানদেরকে বললেন, ইতিপূর্বে তোমাদেরকে অবিশ্বাসীদেরকে যেখানে পাবে সেখানে তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছিল, এখন ঈশ্বর চান যে ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে তোমরা সকল মানুষকে ভালোবাস। ইতিপূর্বে যেখানে তিনি বলেছিলেন মেয়েরা বুদ্ধিতে খাটো এবং যদি তারা তোমাদের অবাধ্য হবে বলে ভয় কর তাহলে তাদেরকে প্রহার কর এখন সেখানে তিনি তার মত পরিবর্তন করে বলছেন, নারী এবং পুরুষ সকল বিষয়ে সমান। এবং কাউকেই নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। আগে যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন অবিশ্বাসীরা নরকবাসী হবে এবং সেখানে অনন্তকাল ধরে অগ্নিদগ্ধ হবে সেখানে এখন তিনি বলছেন, তোমাদের কর্মই হবে তোমাদের বিচারের মানদণ্ড। এবং ভাল কাজ ছাড়া তার নিকট তোমাদের বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই। এবং তিনি বিশ্বাসের কারণে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। এখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তোমাদের হৃদয়ের বিশুদ্ধতার দিকে দৃষ্টি দিবেন, মুখের কথার দিকে নয়। তিনি যেখানে ইতিপূর্বে মানুষদের অগ্নিদগ্ধ করার উদ্দেশ্যে নরক তৈরীর জন্য অগণিত স্বর্গীয় মুদ্রা ব্যয় করেছিলেন এখন তিনি সেই নরক প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং পাপীসহ সবাইকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি চান যে, তোমরা তাকে মেনে চলবে, এবং তার প্রতি ভয়ের কারণে নয়, কেবলমাত্র তার প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষকে ভালোবাসো। পরিণত মানুষের ন্যায় আচরণ করো। ইতিপূর্বে তিনি তোমাদের জন্য যুদ্ধ করাকে ভালো বলেছিলেন, এখন তিনি তার মত পরিবর্তন করে বলছেন যুদ্ধ করাটা বর্বর পশুদের জন্য শোভন, মানুষের জন্য শোভন নয়।

এর জন্য প্রয়োজন সাহসের। এটা ছিল মধ্য পারস্যের উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। অবশ্য তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার বাকী জীবন নির্বাসনে অতিবাহিত হয়েছিল। তার অনেক অনুসারীকে হত্যা করা হয়েছিল। এটা ঠিক যে বাহাউল্লাহ্‌র

বক্তব্যে কিছু যৌক্তিকতা ছিল। যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, একমাত্র ঈশ্বরই তার নিজের আইন বাতিলের ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য এই যুক্তি ধোপে টিকে না। তাহলে কি ঈশ্বর যখন মোহাম্মদকে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি গাঁজায় দম দিচ্ছিলেন? এবং তার কথার এত নড়চড় হয় কেন? অনুগ্রহপূর্বক এই সব চালবাজী বন্ধ করুন! হয় আপনি মুসলমান হোন এবং মোহাম্মদ যা বলেছেন তা-ই করুন, নতুবা এই ধর্ম পরিত্যাগ করুন। এবং আসুন আমরা জানি কে আমাদের শত্রু ।

ইসলামের সংস্কার সম্ভব নয়। যত রকম উপায়ে সম্ভব, তত রকম ভাবেই অনেকে সে চেষ্টা করেছে। মুতাজিলারা চেষ্টা করেছে, সুফীরা চেষ্টা করেছে, শত শত পুরাতন এবং নূতন ধারার অনুসারীরা (সম্প্রদায়) চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম ইতিহাসের বর্জ্যস্থানে স্থান পাবার যোগ্য। দয়া করে এটাকে সেখানেই নিক্ষেপ করুন। এটা থেকে মুক্ত হোন এবং এই বাজে জিনিস দিয়ে নিজেকে আর বোকা বানাবেন না। সত্যের মুখোমুখি হোন। হাঁ, সত্যের মূল্য আছে। ইসলাম একটা মিথ্যা, মোহাম্মদ মানসিকভাবে অসুস্থ প্রতারক। এটার পাট চুকিয়ে দিন এবং এর সংস্কারের নামে হাস্যকর তামাশা বন্ধ করুন।

(নিবন্ধটি Ali Sina-এরThe Illusion of Reforming Islam -এর বাংলায় ভাষান্তর। আলী সিনা www.faithfreedom.org-এর সম্পাদক। তিনি Beyond Jihad - Critical Voices from Inside Islam'-এ লিখেছেন। তার সর্বশেষ গ্রন্থ Understanding Muhammad: The Psychobiography of Allah's Prophet নিবন্ধটি www.islam-watch.org থেকে সংগৃহীত) মুসলিম সমাজের মুক্তির জন্য যে গভীর আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন তার জন্য ইসলামের নির্মোহ বিচার আজ সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা চাই ইসলাম সম্পর্কে আমাদের দেশে খোলামেলা ও নির্ভয় বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হোক। সেই বিবেচনা থেকে নিবন্ধটির কিছু বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের মতের ভিন্নতা থাকলেও ইসলামের সংস্কার সম্পর্কে যে সব মত আছে সেগুলি সম্পর্কে লেখকের সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করায় ইংরাজী নিবন্ধটির ভাষান্তর প্রকাশ করা হল।
কুরআনের আয়াতগুলির বঙ্গানুবাদ লেখকের ইংরেজি থেকে না করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কৃত বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

আধুনিক সেরা ইসলামী মিথ্যাচার

তানভীর কামি

ইসলাম জন্ম নিয়েছে তার অনুসারী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে মিথ্যার জাল বুনে। এখন বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ইসলাম ক্রমবর্ধমান হারে চুলচেরা বিশ্লেষণের সম্মুখীন হচ্ছে। ইসলামের ওইসব সমালোচনার মোকাবিলায় ইসলামপন্থীরাও নিত্যনূতন মিথ্যা উদ্ভাবন করে চলেছে। আধুনিক ইসলামী মিথ্যার একটি তালিকা এই রচনায় সন্নিবেশিত হল।

অনেক মুসলমান প্রায়ই গর্ব করে বলে যে ইসলাম তাদের সত্য বলতে শিখিয়েছে। যদিও ইসলামপন্থীরা মুসলমানদের মগজধোলাই করা এবং পশ্চিমা কাফেরদেরকে (অমুসলিম) বোকা বানানোর জন্য সবসময় বিভিন্ন ইস্যুতে মিথ্যা ও ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। ইসলামে বিশ্বাসের কারণে মুসলমানরা ইসলামপন্থীদের এসব প্রচারকে কখনো চ্যালেঞ্জ করে না। সাধারণ মুসলমানরা এই মিথ্যাচার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং মিথ্যাগুলোকে সত্য বলে ধরে নেয়। ‘কাফের’ বিল গেটস কম্পিউটারে উইনডোজ অপারেটিং পদ্ধতি প্রবর্তন করার পর বিশ্ব পাল্টে গেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। তার পর থেকে ইন্টারনেট দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ইহুদী কাফেররা (ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু) ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবপেজ।

কম্পিউটার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইসলামপন্থীদের মিথ্যার পদ্ধতিও পাল্টে গেছে। অনেক ইসলামপন্থী এখন প্রযুক্তিতে দক্ষ। তারা ওয়েবসাইট চালায়, ইসলামী ই-মেইল পাঠায় মুসলমানদের কাছে, এবং ফেসবুকে ইসলামিক পেজ খুলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ইসলামপন্থীরা এবং কতিপয় ধর্মান্ধ মুসলমান ইন্টারনেট এবং ইহুদীদের ফেসবুকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায়। এটা কৌতুকের ব্যাপার নয় কি? এটাকে হাস্যকর বললেও কম বলা হয়!

মিথ্যা সবসময় ইসলামী কথাবার্তা ও প্রচারণার অংশ। পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অভিবাসন এবং ইন্টারনেটের আধুনিক যুগের কারণে এসব মিথ্যার কৌশলের আধুনিকায়ন ঘটেছে। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে সাধারণ মুসলমান ও কাফেরদের কাছে সবসময় প্রচলিত মিথ্যার বেসাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। নীচে বহুল প্রচলিত আধুনিক মিথ্যার তালিকা দেওয়া হল। এগুলোর সঙ্গে অধিকাংশ মুসলমান এবং কাফের ইতিমধ্যে পরিচিত।

১. আধুনিক বিজ্ঞান এসেছে কুরআন থেকেঃ বিজ্ঞানীরা (অবশ্যই যাদের বেশীরভাগ হচ্ছেন সাচ্চা কাফের) নিবিড় গবেষণায় জীবন কাটান এবং শেষ পর্যন্ত নূতন কিছু আবিষ্কারে সক্ষম হন (ইসলামপন্থীরা দাবী করে যে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলো মূলত কুরআনে বর্ণিত আছে।) কিন্তু কুরআনের কোথায় এসব সূত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়? যদি কুরআন বিজ্ঞানের বই হয়ে থাকে তবে মাদ্রাসার ছাত্ররা কেন বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক হচ্ছে না? তারা কি সাধারণ মুসলমান এবং কাফেরদের চেয়ে আরো ভালোভাবে কুরআন চর্চা করে না? কিন্তু বিজ্ঞানী হওয়ার পরিবর্তে মাদ্রাসার অনেক ছাত্র কেন সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী হচ্ছে?

২. কুরআন এ পর্যন্ত লেখা সর্বোত্তম গ্রন্থঃ আসলেই? কোন্ ভিত্তিতে? ক'জন মুসলমান কুরআন পড়ে এবং এর সকল আয়াতের অর্থ বুঝে? এমনকি আরবের বহু মুসলমান নিছক বিশ্বাসের কারণে কুরআন পড়ে; কিন্তু কুরআনের আয়াতের প্রকৃত

অর্থ বিশ্লেষণ করে না। দাবী করা হয় কুরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং মানুষের পক্ষে এ ধরনের বই লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু ৯০ শতাংশের বেশী মানুষ বইটি পড়ে নাই (মুসলমানরাও ভালভাবে পড়ে নাই) এবং এমনকি এটা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

কুরআনের কোন্ অংশ অন্যান্য পুস্তকের চেয়ে উন্নত? মানব জাতি কীভাবে এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত যা অন্য কোন বই পড়ে সম্ভব নয়? বাস্তবে কুরআনে কোন ধারাবাহিকতা নাই; এতে রয়েছে গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি। উপরন্তু কুরআন মুসলমানদেরকে কাফেরদের ঘৃণা করতে, হত্যা করতে শিখায়, বৌ পিটাতে বলে, ইসলামের সমালোচকদের এবং ইসলামত্যাগী মুসলমানদের হত্যার আহবান জানায়, চোরদের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এরকম আরো বহু কিছু আছে। অভিন্ন গ্রন্থ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সুন্নী ও শিয়া মুসলমানরা প্রতি সপ্তাহে পরস্পরকে খুন করে চলেছে। হ্যাঁ, তারপরেও বলতে হবে কুরআন দুনিয়ার বুকে এক মহান গ্রন্থ!

৩. ৯/১১-এর পরিকল্পনা করেছিল বুশ ও ইহুদীরাঃ উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী অনেক মুসলমান এখনো বিশ্বাস করে মুসলমানরা কখনই ৯/১১-এর ঘটনায় জড়িত ছিল না। তারা প্রায়ই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। ধরে নেওয়া যাক মুসলমানদের এই দাবী সঠিক যে ইহুদীরা এবং বুশ ৯/১১-এর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। তাহলে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৩০০০-এর বেশী মানুষ নিহত হওয়ার এসব ঘটনায় সাচ্চা মুসলমানরা (আরবের মুসলমান) এত খুশী কেন? কেন ফিলিস্তিনী মহিলারা হামলাকারীদের প্রশংসা করে উল্লাসে নৃত্য করেছিল? ইহুদী এবং বুশের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাদের আনন্দের সম্পর্ক কী? ওইসব সাচ্চা ও আধাসাচ্চা আরবীয় মুসলমান কি ইহুদী এবং আমেরিকাকে ঘৃণা করে না? ৯/১১ ইহুদী এবং বুশের ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলে তারা এবং অন্যান্য মুসলমান যে এত খুশী হল তার হেতু কী?

৪. সৌদী আরব, ইরান আর সাবেক তালেবানী আফগানিস্তান প্রকৃত ইসলাম রাষ্ট্র নয়ঃ তাহলে কোন্ মুসলিম রাষ্ট্রে অন্তত পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম চর্চার চেষ্টা করা হয়? এই মিথ্যা দাবীর মূল কারণ হচ্ছে এসব দেশে হাত কেটে ফেলা, মস্তক ছেদন, পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা এবং পিটানো হয়। এ ধরনের আচরণ অমানবিক হিসাবে বিবেচিত এবং আধুনিক মধ্যপন্থী মুসলমানরা এসব ইসলামী আচরণে লজ্জা পায়। এসব তথাকথিত মুসলমান সৌদী আরবে গিয়ে সৌদীদের শেখাতে এবং দেখাতে পারে যে দেশটি আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নত অনুসরণ করছে না।

৫. পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামের মূল্যবোধ চুরি করেছেঃ আধুনিক ইসলামপন্থীরা বলে, "মুসলিম দেশগুলোর কোথাও আল্লাহ ও মুহাম্মদের নির্দেশ অনুসারে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চর্চা হয় না। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর এই দুর্দশা।" একই সঙ্গে এই ইসলামপন্থীরা মুসলমান ও কাফেরদের একথা বলে মগজ ধোলাই করতে চায় যে, পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামী মূল্যবোধসমূহ বেশী মাত্রায় অনুসরণ করে, যা অধিকতর স্বাধীনতা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করেছে। এটা কি আসলেই সত্য? পশ্চিমা দেশগুলোর মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে খ্রীষ্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং মানবতাবাদ। সে কারণে গোটা বিশ্বের মানুষ স্বাধীনভাবে সমঅধিকার নিয়ে বাস করার জন্য পাশ্চাত্যকে (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে) পছন্দ করে।

ইসলামপন্থীরা দ্রুতই আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, পশ্চিমা কাফেররা পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য ইসলামী ভাবধারা চুরি করেছে। পশ্চিমা কাফেররা ইসলামের একটা শব্দও জানে না অথচ ইসলামের মূল্যবোধ চুরি করে ফেলল! কী মজার ব্যাপার; তাই না? সৌদী আরব এবং অন্যান্য ইসলামী দেশের মুসলমানদের বেলায় কী ঘটেছে? তারা কি ইসলাম এবং ইসলামী মূল্যবোধ বোঝে না? তাহলে তারা নিজেদের দেশে পশ্চিমাদের মত সকলের জন্য সমঅধিকার নিশ্চিত করে না কেন?

৬. পশ্চিমারা দ্রুতবেগে ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছেঃ পশ্চিমা কাফেররা প্রতিদিন বিপুল

সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে একথা সত্য হলে পশ্চিমা দেশগুলো কি শিগগিরই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে না? তার কোন লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে? নব্য ধর্মান্তরিত পশ্চিমা মুসলমানরা কোথায়? মসজিদে অথবা অন্যকোন ইসলাম ধর্মীয় কর্মসূচীতে তাদের তো দেখা যায় না! অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমান হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ। তাদের মধ্যে কিছু শ্বেতাঙ্গ বাউণ্ডুলেও আছে। সমাজে তারা মূল্যহীন। প্রায় সব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে এবং সরকারী টাকায় জীবন চালায়। ক'জন পুলিশ অফিসার, সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব অথবা প্রফেসর ইসলাম গ্রহণ করেছে? এবং তারা কোথায়?

৭. ইসলাম নারীদের সমমর্যাদা এমনকি অনেক বেশী অধিকার দিয়েছেঃ এ দাবী একেবারে বোকার মত হয়ে গেল না? নারীরা ইসলামিক দেশগুলোতে দুনিয়ার অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে অনেক বেশী অবদমিত এবং তাদের অধিকার একেবারেই সীমিত। তারা গাড়ী চালাতে পারে না, রাস্তায় একা চলাফেরা করতে পারে না, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না (স্বামী পাগল না হলে) এবং আরো অনেক কিছু করতে পারে না। সৌদী আরবের মত দেশে যেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চা হয় সেখানে এ পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম যদি নারীদের পূর্ণ অধিকার দিয়ে থাকে তবে কেন শুধু ইসলামী দেশগুলোতে নারীরা এমন অধিকারহীন?

৮. ইহুদীরা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মার্কিন/কানাডীয় ও বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করেঃ আধুনিক ইসলামপন্থীরা এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা বলে থাকে যে, ইহুদীরা মিথ্যা কথা বলে এবং মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের হামলা অতিরঞ্জিত করে দেখায়। তারা ইহুদীদের অপরাধের খবর কখনো পরিবেশন করে না। মুসলমানদের অপরাধের জন্য কি এই মুসলমানরা ইহুদীদের দায়ী করতে চায়? আজকের দিনে ৯৯.৯% সন্ত্রাসী হামলা মুসলমানরা ঘটিয়ে থাকে। কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারবে? বাস্তবে ইহুদীরা মুসলমান, হিন্দু বা অন্য যে কোন কাফেরের তুলনায় অত্যন্ত কম অপরাধ করে থাকে। কেউ কি ইহুদীদের এমন বিরাট তালিকা দেখাতে

পারবে যারা অন্য ধর্মাবলম্বী অথবা জাতিসত্তার লোকদের মত নিয়মিতভাবে নারী ধর্ষণ, নরহত্যা এবং মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত?

ইসরাইলে এবং ফিলিস্তিনে কোন হামলা হলে একই ধরনের খবর বিবিসি, সিএনএন, ইসলামী আল-জাজিরা এবং অন্যান্য মিডিয়ায় দেখা যায়। যদি ইহুদীরা মার্কিন/কানাডীয় রাজনীতিতে গভীরভাবে অংশ নিয়ে থাকে তবে দোষের কী হয়েছে? মুসলমানরাও স্বচ্ছন্দে এতে অংশ নিতে পারে। কিন্তু তারা সেটি করবে না; কারণ পশ্চিমা রাজনীতি ইসলামের শত্রু কাফেরদের দ্বারা প্রণীত।

ধরে নেওয়া যাক (মুসলমানদের কথা অনুসারে) সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী খাত এককভাবে ইহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে মুসলমানরা কি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ভীতিকর পরিবেশের তুলনায় ইহুদী নিয়ন্ত্রিত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অনেক ভালভাবে বসবাস করছে না? ইহুদীরা কি মুসলমানদের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে না? অভিবাসী মুসলমানরা কি এমন সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধা কোন ইসলামী দেশে পেয়ে থাকে? এই ইহুদীরা কি গরীব দেশগুলোকে অব্যাহতভাবে সাহায্য করছে না; যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর খাদ্য সাহায্য নিয়ে ছুটে যায় না? কোন ইসলামী দেশ কি এসব করে? তাহলে কারা ভাল, ইহুদীরা নাকি মুসলমানরা?

৯. উপবাস থাকলে মানুষের আহারে ভারসাম্য আসেঃ একদিন বাংলাদেশের এক টিভি চ্যানেলে ইসলাম বিষয়ক এক আলোচনায় একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপবাস থাকা (রোজা রাখা) যে মানুষের জীবনের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, ‘‘রোজা রাখা হচ্ছে আমাদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের সময়ের নিছক পরিবর্তন মাত্র। এটা আমাদের শরীর পুনর্গঠনে সাহায্য করে। মানুষের জন্য বছরে একবার এ ধরনের পরিবর্তন দরকার। এভাবেই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।’’ রোজা সম্পর্কে বলার মূল বিষয় ছিল ইসলাম মানুষকে রোজা রাখতে বলে কী উপকার করেছে তা বোঝানো। অনেক মুসলিম দেশে সন্ধ্যা

৬ টার দিকে ইফতার করা হয়। রোজার সময় মুসলমানরা সকালের এবং দুপুরের খাবার খায় না। ইফতার রাতের খাবার আগে খেয়ে ফেলার কাজ দেয়। এসময় অনেক মুসলমান ঠিক ফজরের নামাজের আগে ভোর রাত প্রায় ৪টার দিকে সেহরী খায়। হতে পারে এ ধরনের সাময়িক পরিবর্তন শরীরের জন্য ভাল এবং ওই ডাক্তারের দাবী সঠিক। কিন্তু এটা কি শুধু ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসকারী মানুষের জন্য সঠিক? বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে সময়ভেদে দিনের আলো অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেখানকার লোকদের বেলায় কী হবে? এই লোকগুলি কি দৈনিক ২২ ঘন্টা বা আরও বেশী সময় না খেয়ে থাকতে পারবে? এটা কি স্বাস্থ্যকর? ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে? যদি রোজা রাখা আমাদের জন্য উপকারী হয় তবে গোটা মানবজাতির জন্য তা হওয়া উচিৎ। কুরআন এবং হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ ছিল। সে ব্যাখ্যা কোথায়?

১০. ইসলাম সর্বোত্তম জীবন বিধান দিয়েছেঃ যদি এ দাবী সত্য হয় তবে মুসলমানদের মধ্যে এবং ইসলামী দেশগুলোতে আমরা কি সর্বোত্তম জীবন বিধান লক্ষ্য করি? কেন কাফেররা (প্রধানত পূর্ব এশীয় ও পশ্চিমা) গড়ে মুসলমানদের চেয়ে দীর্ঘজীবী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়?

১১. ইসলাম শান্তির ধর্মঃ আধুনিক মুসলমান এবং জাকির নায়েকের মত ইসলাম প্রচারকদের সবচেয়ে প্রিয় বুলি হচ্ছে এটা। ইসলাম যদি শান্তি এনে থাকে তবে মুসলমানদের মধ্যে এত বেশী সন্ত্রাসী কেন? কেন মুসলমানরা পরস্পরকে খুন করছে? কেন মুসলমানরা (কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে) সবসময় আক্রমণাত্মক থাকে? কেন সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা করা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত?

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ কিছুদিন পরপর পাকিস্তান, ইরাক ও আফগানিস্তানে ডজন ডজন মানুষ আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে। অথচ মুসলমানদের মধ্যে (প্রধানত সুন্নী) এ ধরনের হামলা নিষিদ্ধ। যদি পাকিস্তানের সকল মুসলমান

রাতারাতি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান, হিন্দু বা নাস্তিক বনে যায় তবে পরদিন থেকে সেদেশে কি একটাও আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটবে? পাকিস্তান কি তার নিরীহ লোকদের হারাতে থাকবে?

১২. মোল্লারা ইসলামের প্রকৃত পথ অনুসরণ করে নাঃ আধুনিক মুসলমানরা মোল্লাদের ঘৃণা করে। আর পাশ্চাত্যের নিরীহ কাফেরদের এই বলে মগজ ধোলাই করতে পেরেছে যে, মোল্লারা সুশিক্ষিত নয় এবং তারা ভালভাবে ইসলাম বুঝে না। একথা কি সত্য? এসব তথাকথিত আধুনিক মুসলমান কি কখনো কুরআন-হাদীস পড়েছে? যে মুসলমান ইসলাম কুরআন, হাদীস ও শরিয়া) নিয়ে পড়াশুনা করে জীবন কাটায় সে কি যেসব মুসলমান কুরআন-হাদীসের একটা শব্দেরও অর্থ বুঝে না তাদের চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে না? বস্তুত উপরোক্ত আধুনিক মিথ্যাগুলো অনেক মুসলমান ও ইসলামপন্থীর গলায় শুনা যায়। উপরোক্ত মিথ্যাগুলোকে চ্যালেঞ্জ না করা পর্যন্ত মুসলমানরা কখনো সত্য জানবে না। ইসলামপন্থীরা মুসলমান ও কাফেরদের কাছে মিথ্যা বলতেই থাকবে। মুসলমানরা এই মিথ্যাচার সম্পর্কে সচেতন হলে এবং এগুলো সর্ম্পকে মন্তব্য করার সুযোগ পেলে এসব মিথ্যা কথা বলা একদিন বন্ধ হবে। ইসলামপন্থীরা ইউটিউব এবং ফেসবুক পছন্দ করে না; কারণ সেখানে যে কেউ ইচ্ছামত মন্তব্য করতে পারে। ইসলামপন্থীরা ইসলাম এবং তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে কোন মন্তব্য শুনতে রাজি নয়। মুসলমানরা পাশ্চাত্যে অবাধে ইসলাম চর্চা ও প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে। একই সঙ্গে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে এবং তাদের দাবী সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য শুনবার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

(পাশ্চাত্য অভিবাসী বাংলাদেশী লেখক Tanvir Kami –এর Top Modern Islamic Lies নামক নিবন্ধটি ওয়েব সাইট ইসলাম ওয়াচে ১৫ নভেম্বর ২০১০-এ প্রকাশিত হয়)
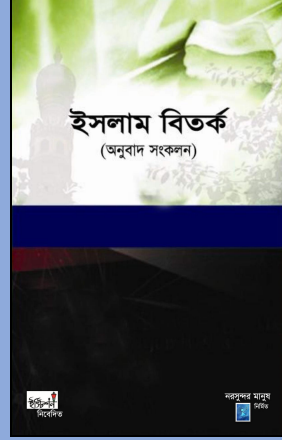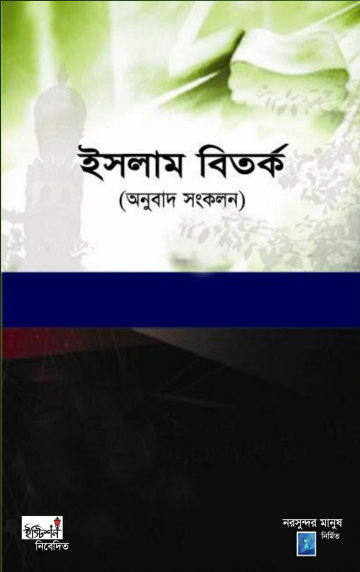
ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের কল্যানে বর্তমান পৃথিবীর ভাবজগতে যে বিপ্লব চলছে তার ঢেউ আছড়ে পরেছে ইসলাম ধর্মের উপরেও। বোমাবাজি, হামলা, সন্ত্রাস, হত্যা কোনটা দিয়ে ইন্টারনেটকে ঠেকানো সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীতে যারা এতকাল ইসলামের বিষয়ে বিচার ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তা করলেও প্রচারের সুযোগের অভাবে নিশ্চুপ থেকেছেন তারা এখন সবর হতে শুরু করেছেন।

বিদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এ ধরনের কয়েকটি ইংরেজি নিবন্ধের অনুবাদ নিয়ে প্রকাশ করা হল **ইসলাম বিতর্ক** নামক সংকলন গ্রন্থটি।

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com